স্মৃতির সরণি বেয়ে ...

ড. সুমন্ত্র দত্ত

আমাদের সকলের হৃদয়ে চিরজাগ্রত থাকে কিছু বিশেষ অনুভূতি, যা আমাদের ফিরিয়ে নিয়ে যায় অতীতে, তাদের 'স্মৃতি' বলা হয় এবং তা স্পন্দিত হয় হৃদয়ের অন্তঃস্থলে। আর কিছু অনুভূতি আমাদের এগিয়ে নিয়ে যায়, তাদের বলা হয় 'স্বপ্ন', যা আমাদের দিয়ে পরিশ্রম করায়, অসম্ভবকে সম্ভব করার চেষ্টা করতে উৎসাহ দেয়। গতকাল হল আজকের 'স্মৃতি', কিন্তু আগামীকাল হল আজকের 'স্বপ্ন'। ভারতবর্ষের স্বাধীনতার প্রায় সমবয়সী আরামবাগ নেতাজি মহাবিদ্যালয়ের (প্রতিষ্ঠা ১৯৪৮ সাল) পঁচাত্তর বছর পূর্তি উপলক্ষ্যে এই মহাবিদ্যালয় সম্পর্কে আমার কিছু স্মৃতি, কিছু স্বপ্ন তুলে ধরার চেষ্টা করছি।

১৯৯৯ সালের এক শরৎকালের সকালে উত্তরপাড়া স্টেশন থেকে তারকেশ্বর লোকালে চেপে তারকেশ্বর পৌঁছে বাস ধরে প্রায় এক ঘন্টারও বেশি পথ উজিয়ে জীবনে প্রথম আরামবাগ পৌঁছেছিলাম। এর আগে 'আরামবাগ' নামটার সঙ্গে পরিচিতি থাকলেও কখনো সেখানে পদার্পণ করিনি। সেই প্রথম। গন্তব্য 'নেতাজি মহাবিদ্যালয়'। এই শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানটির ঠিকানা যে আরামবাগ শহর পেরিয়ে দ্বারকেশ্বর নদের পশ্চিম প্রান্তে কালিপুর, তা তখন জানা ছিল না। তাই আরামবাগ বাসস্ট্যান্ডে নেমে একটা রিকশা নিয়ে নেতাজি মহাবিদ্যালয়ে পৌঁছেছিলাম। উদ্দেশ্য সেখানে ইতিহাসের অধ্যাপক হিসাবে যোগদান। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে, এটি আমার প্রথম কর্মক্ষেত্র ছিল না। এর আগে দীর্ঘ বারো বছর আমি অধ্যাপনা করে এসেছি পশ্চিমবঙ্গের বাইরে সুদূর ত্রিপুরার একটি সরকারি কলেজে। এতদিন জীবিকাজব্দ প্রবাসজীবন যাপনের পর নিজের বাড়ির কাছে ফেরা। যদিও সেই অর্থে আরামবাগ আমার বাড়ির খুব কাছে নয়। তখন প্রায় তিন ঘন্টা সময় লাগতো উত্তরপাড়া থেকে আরামবাগ পৌঁছতে। কারণ তখন তারকেশ্বরের পর রেলপথ ছিল না। তবু ভেবেছিলাম এ আর এমন কি। ত্রিপুরার মতো দূরত্ব তো নয়। আর একটু বেশি সময় লাগলেও কষ্ট করে বাড়ি থেকে যাতায়াত করা যেতে পারে। এই আনন্দে চিরকালের ঘরকাতুরে আমি বাড়ির খুব কাছে না হলেও ত্রিপুরার সরকারি কলেজ ছেড়ে আরামবাগ নেতাজি মহাবিদ্যালয়ে যোগদান করার ব্যাপারে কোনো দ্বিধা করিনি।

আরামবাগে না এলেও আরামবাগের ইতিহাস আমার অল্পবিস্তর জানা ছিল। জানতাম আরামবাগ একটি বর্দ্ধিষ্ণু শহর। একসময় এর নাম ছিল 'জাহানাবাদ'। পরবর্তীকালে এটি 'আরামবাগ' নামে পরিচিত হয়। ১৭৯৫ সালে ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি বর্ধমান জেলাকে বিভাজিত করে। উক্ত জেলার দক্ষিণাংশ নিয়ে হুগলি জেলা গঠিত হয়। ১৮৭৯ সালের আগে এই জেলা সদর ও শ্রীরামপুর নামে দুটি মহকুমায় বিভক্ত ছিল।

* অধ্যাপক, ইতিহাস বিভাগ

১৮৭৯ সালে 'জাহানাবাদ' নামে একটি পৃথক মহকুমা গঠিত হয়। গয়া জেলায় (অধুনা বিহার রাজ্যে অবস্থিত) একটি জাহানাবাদ থাকার জন্য ১৯০০ সালে জাহানাবাদ মহকুমার নাম পরিবর্তন করে আরামবাগ মহকুমা রাখা হয়। তবে এসব ইতিহাস অনেকেরই জানা। তাই বিশেষ পুনরুক্তি না করাই শ্রেয়। কিন্তু আরামবাগ সম্বন্ধে যে কারণে আমার কৌতুহল ছিল সেটি অন্য। জানতাম সাহিত্যসম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 'দুর্গেশনন্দিনী' (১৮৬৫ সালে প্রকাশিত) উপন্যাসের প্রেক্ষাপট ছিল এই মহকুমার গড়মান্দারণ। আরামবাগের অদূরে আছে বিখ্যাত কামারপুকুর এবং জয়রামবাটি। শ্রীরামকৃষ্ণ এবং মা সারদার স্মৃতি বিজড়িত পবিত্র ভূমি। এছাড়া আরামবাগের কাছে বিখ্যাত রাধানগর গ্রাম, যে গ্রামটিতে জন্ম নিয়েছিলেন ঊনবিংশ শতাব্দীর বাংলার প্রথম আধুনিক মানুষ, সমাজ ও ধর্মসংস্কারক এবং ব্রাহ্মসমাজের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা রাজা রামমোহন রায়। পড়েছিলাম আরামবাগের একজন বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব হলেন আরামবাগের নিকটবর্তী বদনগঞ্জ নিবাসী 'ধর্মমঙ্গল' কাব্যের আদি কবি খেলারাম চক্রবর্তী। দ্বিজ শ্রীরামজীবন ('সুভদামঙ্গল' বা 'সুবচনীমঙ্গল' কাব্যের কবি) আরামবাগ মহকুমার আরাণ্ডি গ্রামের নিবাসী ছিলেন। এছাড়া স্বাধীনতা আন্দোলনে আরামবাগ মহকুমার বিশেষ অবদান তো ছিলই। এইসব কারণে আরামবাগ সম্বন্ধে আগ্রহ আমার কিছুটা বেড়ে গিয়েছিল নিঃসন্দেহে। তবে শুধু আরামবাগ শহর নয়, আরামবাগ 'নেতাজি মহাবিদ্যালয়' নামটির সঙ্গেও একটি কারণে আমার পূর্বপরিচিতি ছিল। ত্রিপুরায় অধ্যাপনার সময়ে অধ্যাপক গোপালচন্দ্র সিনহার 'ইংল্যাণ্ডের ইতিহাস' বইটির সঙ্গে পরিচিতির পাশাপাশি জেনেছিলাম অধ্যাপক সিনহা এই কলেজেরই ইতিহাসের অধ্যাপক। পরে অবশ্য ওনার লেখা অন্যান্য গ্রন্থের সঙ্গেও পরিচিতি ঘটেছে। তাই যখন সুদূর ত্রিপুরায় বসে আরামবাগ নেতাজি মহাবিদ্যালয়ে যোগদানের চিঠি পেলাম তখন অবশ্যই এই কলেজটিকে আমার অচেনা মনে হয়নি।

নির্দিষ্ট দিনে কলেজে পৌঁছে ইতিহাসের অধ্যাপক হিসাবে যোগদান করলাম। তখন অধ্যক্ষ ছিলেন প্রয়াত বিজয়কৃষ্ণ ঘোষ মহাশয়। উল্লেখযোগ্য যে, তাঁরও বিষয় ছিল ইতিহাস। তাঁর সঙ্গে আলাপ ও প্রাথমিক কাজকর্ম সারার পর অধ্যাপকদের জন্য নির্দিষ্ট বিশ্রামকক্ষে এলাম। বর্তমানে যেখানে উদ্ভিদবিদ্যা বিভাগের পরীক্ষাগার, তখন সেটিই ছিল অধ্যাপকদের বিশ্রামকক্ষ। প্রথমেই সকল অধ্যাপক-অধ্যাপিকাদের সঙ্গে আলাপ-পরিচয়ের পালা সাঙ্গ হল। বলতে দ্বিধা নেই সকলেই অত্যন্ত আন্তরিকতার সঙ্গে আমাকে গ্রহণ করেছিলেন। মনেই হল না আমি সবেমাত্র এখানে যোগদান করেছি। সেদিন অবশ্য ইতিহাস বিভাগের প্রধান ড. গোপালচন্দ্র সিনহা ছুটিতে ছিলেন। তৎকালীন ইতিহাস বিভাগের আরও দুজন আংশিক সময়ের অধ্যাপকদের (শ্রী গৌতম দে ও শ্রী সুকান্ত নন্দী, যাঁরা বর্তমানে অন্য প্রতিষ্ঠানে কর্মরত) সঙ্গে আলাপ হয়েছিল। গোপালবাবুর সঙ্গে আলাপ হয়েছিল পরের দিন। প্রাথমিক আলাপেই উনি আমাকে আপন করে নিয়েছিলেন। এছাড়া এখানে অন্যান্য বিভাগের আরও অনেকের সঙ্গেই ধীরে ধীরে আমার হৃদ্যতার সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল, যা আজও

অটুট।

প্রথম যে ক্লাসটি আমি নিয়েছিলাম, সেটি ছিল একাদশ শ্রেণীর ইতিহাস ক্লাস। তখন পশ্চিমবঙ্গে স্কুলের সঙ্গে কিছু কলেজেও উচ্চমাধ্যমিক পড়ানো হতো। আমাদের এই কলেজও তার ব্যতিক্রম ছিল না। ত্রিপুরায় দীর্ঘদিন স্নাতকস্তরে অধ্যাপনার অভিজ্ঞতা থাকায় এই ক্লাসটি আমার অধ্যাপনা জীবনের প্রথম ক্লাস ছিল না ঠিকই, তবে একাদশ শ্রেণীর অত্যন্ত কম বয়সী ছাত্র-ছাত্রী, যাদের অন্তরে স্পন্দিত হত একটি কোমল হৃদয়, তাদের পড়ানোর অভিজ্ঞতা নতুন। পরবর্তীকালে একাদশ-দ্বাদশ শ্রেণীর ছাত্র-ছাত্রীদের ক্লাস আমার কাছে অত্যন্ত আকর্ষণীয় হয়ে উঠেছিল। অবশ্য কলেজগুলিতে কয়েক বছর পর উচ্চমাধ্যমিকের পাঠদান বন্ধ হয়ে যায়। ধীরে ধীরে একইসঙ্গে নিয়মমাফিক অন্যান্য ক্লাসও (অনার্স ও পাস কোর্সের ক্লাস) নিতে শুরু করেছিলাম। এখানকার ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে যে জিনিসটি বিশেষভাবে লক্ষ্য করেছিলাম সেটি হল, বেশিরভাগ ছাত্র-ছাত্রীই পড়াশোনায় আগ্রহী। যে কোন বিষয়ে প্রশ্ন করতে তারা দ্বিধা করত না এবং সেই প্রশ্নোত্তর পর্ব আমার কাছে অত্যন্ত আকর্ষণীয় ছিল, যা আমাকে আরো ভালো করে নিজেকে প্রস্তুত করতে উৎসাহিত করত। তখন আরেকটা বিষয় আমাকে খুব আশ্চর্য করেছিল সেটি হচ্ছে, বিকেল সাড়ে তিনটের শেষ ক্লাসেও শ্রেণীকক্ষভর্তি ছাত্র-ছাত্রীদের উপস্থিতি। আর ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে ছিল গভীর শৃঙ্খলাবোধ, যা আজও বজায় আছে। শুধু তাই নয়, খেলাধুলাসহ অন্যান্য পাঠক্রম বহির্ভূত কার্যকলাপেও (যেমন, ক্যুইজ, গান, আবৃত্তি, চিত্রাঙ্কন, বিতর্ক ইত্যাদি বিষয়ে) ছাত্র-ছাত্রীরা সমান উৎসাহী। ছাত্র-ছাত্রীদের উৎসাহেই দীর্ঘদিন ধরে নিয়মিত প্রকাশিত হচ্ছে ইতিহাস বিভাগের প্রাচীর পত্রিকা 'শিলালিপি'। পড়াশোনার পাশাপাশি ছাত্র-ছাত্রী ও বিভাগীয় সহকর্মীদের সঙ্গে বিভিন্ন সময়ে নানা ঐতিহাসিক স্থানে ভ্রমণের (বিষ্ণুপুর, মুর্শিদাবাদ, গৌড়, পাণ্ডুয়া, বারানসী, সারনাথ) অভিজ্ঞতা আমার মনের মণিকোঠায় এখনও উজ্জ্বল। এই ধরণের ভ্রমণ ছাত্র-ছাত্রীদের সঙ্গে শিক্ষকদের সম্পর্ক আরও নিবিড় করে তোলে। অজানাকে জানা, অচেনাকে চেনা, অপূর্ণতাকে পূর্ণ করতে সাহায্য করে এই ধরণের ভ্রমণ। বৃদ্ধি করে আত্মবিশ্বাস। চিরাচরিত শ্রেণীকক্ষভিত্তিক পড়াশোনার বাইরে এক প্রত্যক্ষ শিক্ষায় শিক্ষিত করে তোলে ছাত্র-ছাত্রীদের। ইতিহাসকে চোখের সামনে উপলব্ধি করার অভিজ্ঞতা তাদের সমৃদ্ধ করে।

আমার অধ্যাপনা জীবনের প্রথমদিন থেকে একটা কথায় আমি বিশ্বাস করে এসেছি। সেটি হল, The main duty of a teacher is to bring the horse near the water and make it thirsty, শিক্ষকের প্রধান কর্তব্য হল বিষয় সম্পর্কে ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে আগ্রহ সৃষ্টি করা। একবার আগ্রহ সৃষ্টি হলে তারা নিজেরাই বিষয়ের গভীরে প্রবেশ করতে চাইবে। আমি প্রথম থেকেই ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে ইতিহাস সম্পর্কে আগ্রহ সৃষ্টি করতে চেয়েছিলাম। এক্ষেত্রে আমি যে সম্পূর্ণ সফল হয়েছি এমন দাবি করবো না। কিন্তু এটুকু বলতে পারি

যে, সকলকে না হলেও কিছু ছাত্র-ছাত্রীকে অবশ্যই ইতিহাস সম্পর্কে উৎসাহিত করতে পেরেছি। একবার আগ্রহ সৃষ্টি হবার পর তারা আমাকে প্রশ্ন করেছে। আমার থেকে উত্তর জেনেছে এবং ইতিহাসের গভীরে প্রবেশের চেষ্টা করেছে। আজও যখন রাস্তায় কিংবা বাসে বা ট্রেনের কামরায় হঠাৎ দেখা হওয়া কোন প্রাক্তন ছাত্র বা ছাত্রী আমাকে মনে করিয়ে দেয়, কবে কোন্ ক্লাসে তাদের বিশেষ কোনো গ্রন্থ পাঠের পরামর্শ দিয়েছিলাম, পাঠ্যসূচীর বাইরে ইতিহাসের নানা প্রশ্ন উত্থাপন করেছিলাম, ইতিহাসকে নিরপেক্ষভাবে বিশ্লেষণ করতে শিখিয়েছিলাম - তখন মনে হয় শিক্ষক হিসাবে সামান্য হলেও সফল হয়েছি। ছাত্র-ছাত্রীরাই আমাকে উদ্দীপ্ত করেছে, সমৃদ্ধ করেছে। এক অর্থে এরাও আমার শিক্ষক।

আমাদের মহাবিদ্যালয়ের বর্তমান ইতিহাস বিভাগ সম্পর্কে দু-একটি কথা বলতে চাই। এই বিভাগের শিক্ষকদের মধ্যে রয়েছে পারস্পরিক সুন্দর সম্পর্ক। অধ্যাপক ডক্টর গোপালচন্দ্র সিন্‌হা ও আমি ছাড়া বর্তমানে এই বিভাগে আছেন অধ্যাপক উদয় সাউ, অধ্যাপিকা সুজাতা রায় এবং অধ্যাপক মণিশঙ্কর সরকার। আমরা সকলে মিলে এবং ছাত্র-ছাত্রীরা এই বিভাগকে এগিয়ে নিয়ে চলেছি। ইতিহাস বিভাগে বিশ্ববিদ্যালয় স্তরের পরীক্ষার ফলাফলই তার প্রমাণ। প্রসঙ্গত বলা যায় বিগত ২০১০ ও ২০১৪ সালে যথাক্রমে প্রিয়াঙ্কা মেটা ও সুমন পাত্র ইতিহাস অনার্সে বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রথম শ্রেণীতে প্রথম স্থান অধিকার করেছিল। তবে শুধু ইতিহাস বিভাগ নয়, এখানে সামগ্রিকভাবে সব বিভাগেরই পরীক্ষার ফলাফল উঁচুমানের।

এই মহাবিদ্যালয়ে দীর্ঘ দুই যুগ অতিক্রান্ত হতে চলল আমার অধ্যাপনা জীবন। কর্মজীবন থেকে অবসর গ্রহণের সময়ও দ্রুত এগিয়ে আসছে। তখন হয়ত ফেলে আসা দিনগুলোর স্মৃতি রোমন্থনই হবে অবসর জীবনের অবলম্বন। আমি যখন এখানে যোগদান করি, তখন এই মহাবিদ্যালয় সুবর্ণজয়ন্তী অতিক্রম করেছিল। তার পর থেকে আজ পর্যন্ত বর্তমান অধ্যক্ষ ড. অসীম কুমার দে মহাশয়ের কার্যকালে এই মহাবিদ্যালয় সবদিক থেকেই অনেক বড় হয়েছে, সমৃদ্ধ হয়েছে। দীর্ঘ পঁচাত্তর বছর সুনামের সঙ্গে অতিবাহিত করে শতবর্ষের দিকে ধাবিত এই মহাবিদ্যালয় আজ স্বমহিমায় উদ্ভাসিত। আশা রাখি আগামী প্রজন্ম এই মহাবিদ্যালয়ের গরিমাকে আরও দীপ্ত করে তুলবে, আর এই শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান যাতে জ্ঞানের প্রদীপ হাতে শতবর্ষ অতিক্রম করে করে আরও দেদীপ্যমান হয়ে উঠে লালন করবে সেই স্বপ্ন। মনে রাখতে হবে স্বপ্ন দেখা মানুষেরাই চাঁদের আলোয় পথ খুঁজে নিতে পারে আর তারাই প্রথম দেখতে পায় ভোরের সূর্যোদয়।

নেতাজী মহাবিদ্যালয় ও উদ্ভিদবিদ্যা বিভাগ

ড. জীবন কুমার পাল

আমাদের প্রিয় নেতাজী মহাবিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা দিবস ১ আগস্ট, ১৯৪৮। কলেজের প্রতিষ্ঠার সঙ্গে বিশেষভাবে যুক্ত ছিলেন কিছু সমাজসেবী, শিক্ষানুরাগী ও রাজনৈতিক ব্যক্তি, যাঁদের মধ্যে প্রধান কাণ্ডারী ছিলেন ডাঃ রাধাকৃষ্ণ পাল। গতবছর ২০২২ সালের ১ আগস্ট কলেজ পঁচাত্তর বছরে পা দিয়েছে, বর্ষপূর্তি হবে ৩১ জুলাই, ২০২৩-এ। এই পঁচাত্তর বছর পূর্তি অর্থাৎ প্লাটিনাম জুবিলি কলেজের ইতিহাসে একটি মাইল ফলক। এই উপলক্ষে যে স্মারক গ্রন্থ প্রকাশ হতে চলেছে, তাতে উদ্ভিদবিদ্যা বিভাগ সম্পর্কে আমার ব্যক্তিগত উপলব্ধি এই প্রবন্ধে উপস্থাপিত করলাম।

❍ **উদ্ভিদবিদ্যা বিভাগ ঃ** আমি কলেজে উদ্ভিদবিদ্যা বিভাগে (Botany) যোগদান করি ৬ মে, ১৯৯৭ সালে। সেই সময় কলেজের প্রিন্সিপাল ছিলেন স্বর্গীয় বিজয়কৃষ্ণ ঘোষ মহাশয় এবং উদ্ভিদবিদ্যা বিভাগে ছিলেন অধ্যাপক স্বর্গীয় কমলকৃষ্ণ সরকার, স্বর্গীয় তরুণ বসু, শ্রী অমলেন্দু সামুই, শ্রী দুর্গাপদ মণ্ডল ও আংশিক সময়ের অধ্যাপক শ্রী প্রবীর কুমার নায়েক ও শ্রী জয়দীপ মুখার্জী। তখন ডিপার্টমেন্ট ছিল খুব ছোটো। দোতলায় যেটা এখন ২০ নং ঘর। ঐ ঘরের একটি কর্ণারে আমরা অধ্যাপকরা বসতাম। বিপরীত কর্ণারে আলমারি সাজিয়ে ঘেরা জায়গাটিতে বি. এসসি. অনার্স ছাত্র-ছাত্রীদের থিয়োরি ক্লাস হতো। এই ঘরের অপর একটি কর্ণারে স্বর্গীয় অধ্যাপক ড. কমলকৃষ্ণ সরকার স্যারের গবেষণাগার ছিল। কমলবাবু রিটায়ার করার পরে আমিও ঐ গবেষণাগারে কাজ করতাম। গবেষণাগারের পাশে সংলগ্ন জায়গাটুকুতে বসতো শিক্ষাকর্মীবৃন্দ। দ্বিতীয় আর একটি ঘর ছিল, সেটি হল পাশেই ১৯ নং ঘর - এটি প্রাকটিক্যাল ক্লাস করার জন্য লম্বা একটি ল্যাবরেটরি হিসাবে ক্লাস চলতো। ঘরের সামনের বারান্দাতেও প্র্যাকটিক্যাল ক্লাস হতো, যখন দুটো ইয়ারের (Part-I & Part-II) প্র্যাকটিক্যাল ক্লাস একসঙ্গে রুটিনে থাকতো। সংলগ্ন লম্বা বারান্দটি ঘিরে বায়োকেমিস্ট্রি ল্যাবরেটরি করা হয়েছিল। এই ছিল বিভাগের চেহারা। শিক্ষাকর্মীবৃন্দ ছিলেন শ্রী নিতাইচন্দ্র গায়েন, স্বর্গীয় সনাতন দে, শ্রী চন্দ্রহাস চক্রবর্তী ও শ্রী বিশ্বনাথ পাখিরা।

অনার্স বিভাগের প্রথমবর্ষে ১৫-১৬ জন ছাত্র-ছাত্রী ছিল, কিন্তু পাস বা জেনারেল কোর্সের প্রথম বর্ষে ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা ছিল অনেক, প্রায় ৭৫-৮০ জন। পরিকাঠামো যাইহোক, ক্লাস ও পড়াশোনা চলতো বেশ ভালোভাবে। ডিপার্টমেন্ট এখন স্থানান্তরিত হয়েছে সায়েন্স বিল্ডিং এ্যানেক্স-এর একতলায়, বৃহৎ এলাকাজুড়ে।

* অধ্যাপক, উদ্ভিদবিদ্যা বিভাগ

ল্যাবরেটরিতে অনেক আধুনিক যন্ত্রপাতি ও মাইক্রোস্কোপ এসেছে। যেমন - অটোক্লেভ ও ল্যামিনার এয়ার ফ্লো, সেন্ট্রিফিউজ মেসিন, ট্রাইনোকুলার রিসার্চ মাইক্রোস্কোপ প্রভৃতি। এসব যন্ত্রপাতি ইনস্টল হবার ফলে ছাত্র-ছাত্রীদের প্র্যাকটিক্যাল ক্লাস খুব ভালোভাবে করানো সম্ভব হচ্ছে। এছাড়া রয়েছে ডিপার্টমেন্ট সংলগ্ন ঔষধি উদ্ভিদের বাগান।

বর্তমানে আমরা ছ'জন অধ্যাপক-অধ্যাপিকা ডিপার্টমেন্টে অধ্যাপনায় নিযুক্ত আছি। অধ্যাপিকা ড. মঞ্জুষা সরকার, ড. সায়নী বিশ্বাস, অধ্যাপক সেখ আফতাবুল আলম, সুবীর সামন্ত, সুজিত পাল ও আমি নিজে, ড. জীবন কুমার পাল। মাঝখানে অধ্যাপক প্রদ্যুৎ বিশ্বাস ও তমাল মণ্ডল বেশ কয়েকবছর অধ্যাপনা করেছিলেন, কিন্তু পরে অন্য কলেজে চলে যান। বর্তমানে শিক্ষাকর্মী আছেন দুজন - শ্রী শ্যামল নায়েক ও সেখ রামিজ রাজা। যাইহোক, বর্তমানে সবাই মিলেমিশে পড়াশোনা বেশ ভালো চলছে, ছাত্র-ছাত্রীদের বিশ্ববিদ্যালয়ের ফলাফলও এখন অনেক ভালো হচ্ছে। ডিপার্টমেন্টে ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যাও আগের তুলনায় বেশ বেড়েছে।

❍ **কৃতী ও প্রতিষ্ঠিত ছাত্র-ছাত্রী ঃ** আমাদের ডিপার্টমেন্টের অনেক কৃতী ছাত্র-ছাত্রী এখান থেকে পাশ করে সমাজের বিভিন্ন জায়গায় সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছে। প্রিয় ছাত্র শান্তি, ড. শান্তিমোহন মণ্ডল বি. এস. সি অনার্স পাস করেছে ১৯৯৭ সালে। তারপর দার্জিলিং গভর্নমেন্ট কলেজ থেকে এম. এসসি (Botany) কমপ্লিট করে আই আই টি খড়গপুরে সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছে, টেকনিক্যাল অফিসার, গ্রুপ-A গেজেটেড অফিসার হিসাবে। শান্তি দার্জিলিং গভর্নমেন্ট কলেজে এম. এসসি পড়ার সময় প্রায়শই আমার কাছে চলে আসতো পড়াশোনার ব্যাপারে পরামর্শ নেবার জন্য। আরো দুজন প্রিয় ছাত্র আমাদের কলেজ থেকে পাশ করে কলেজে অধ্যাপক হিসাবে অধ্যাপনা করছে - রামকৃষ্ণ ঘোষ (পি এস সি-২০১৫), গভর্নমেন্ট জেনারেল ডিগ্রি কলেজ, খড়গপুর-২ এবং শ্রীমন্ত কাঞ্জি (সি এস সি-২০১৯), সিধু কানু বিরশা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে পঞ্চকোট মহাবিদ্যালয়, পুরুলিয়াতে। স্নেহের ছাত্রী অদিতি, অদিতি কোনার ইউরোপ মহাদেশের বেলজিয়ামে ইউরোপ কু লিউভেন বিশ্ববিদ্যালয়ে বৈজ্ঞানিক হিসাবে পোস্ট ডক্টরেট গবেষণা করছে। এরা সবাই আরামবাগ মহকুমার গ্রামের ছেলেমেয়ে, সবাই পড়াশোনা করে স্ব-মহিমায় সুপ্রতিষ্ঠিত।

দীপ্তেশ, দীপ্তেশ চ্যাটার্জী খুব দুষ্টু ছাত্র ছিল, এখন সমাজে সুপ্রতিষ্ঠিত। দীপ্তেশ পুরোপুরি অন্য লাইনে চলে গেছে, বর্তমানে একজন দক্ষ প্রশাসক হিসাবে কাজ করছে পূর্ব বর্ধমানের দেওয়ানদিঘি পুলিশ স্টেশনে সাব ইন্সপেক্টর হিসাবে। আমাদের ডিপার্টমেন্টে কোষ এবং আনবিক জীববিজ্ঞান, জীনতত্ত্ব, জৈব রসায়ন এবং উদ্ভিদ শরীরবিদ্যা, অনুজীববিজ্ঞান প্রভৃতি শাখাগুলি খুব ভালোভাবে পড়ানো হয়। আমাদের ছেলেমেয়েরা

সুগার, প্রোটিন, লিপিড টেষ্টগুলি হাতে-কলমে ভালোভাবে শেখার ফলে হসপিটালের ক্লিনিকাল বিভাগে চাকরির সুযোগ পায়। আমাদের ডিপার্টমেন্টের প্রথমদিকের একজন প্রিয় ছাত্র শ্যামল, শ্যামল কুমার রায় কোলকাতা মেডিক্যাল কলেজে সিনিয়ার মেডিক্যাল টেক্‌নোলজিস্ট হিসাবে সুনামের সঙ্গে কাজ করছে। স্নেহের অর্ঘ্য, অর্ঘ্য সুরল টাটা মেডিক্যাল হসপিটাল (টাটা ক্যানসার হসপিটাল), কোলকাতা, বোনম্যারো ট্রান্সপ্লান্ট ইউনিটে ল্যাবরেটরি টেকনোলজিস্ট হিসাবে সুপ্রতিষ্ঠিত। আমাদের ডিপার্টমেন্ট থেকে পাশ করে গেছে এমন বহু ছাত্র-ছাত্রী উৎপল দাঁ, তন্ময় চৌধুরী, শম্পা খাঁ, নিতা ঘোষ, সুজাতা অধিকারী, শ্যামল সাঁতরা, কৃষ্ণেন্দু সামুই, সঙ্গীতা মানিক, প্রান্তিকা মণ্ডল, শ্রাবন্তী চক্রবর্তী, বর্ণালী ভদ্র, পামেলী মুখার্জী, কার্ত্তিক চন্দ্র, সোমা কুণ্ডু ও অভিজিৎ পালুই দেশের বিভিন্ন জায়গার বিভিন্ন স্কুলে সসম্মানে শিক্ষকতা করছে।

আনন্দের বিষয়, আমাদের ছাত্র-ছাত্রীরাই এখন আমার সহকর্মী। প্রিয় সুজিত, সুজিত পাল আমাদের কলেজ থেকে বোটানি অনার্স পাশ করে ২০১৩ সালে। তারপর বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এম. এসসি (Botany) পাশ করে ২০১৫ সালে, ইউ জি সি নেট পাশ করে ২০১৮ সালে। ২০১৮ সালেই আমাদের কলেজে উদ্ভিদবিদ্যা বিভাগে যোগদান করে। প্রিয় ছাত্র সুবীর, সুবীর সামন্ত আমাদের সঙ্গে অধ্যাপনায় যুক্ত। এটাই আমাদের বিভাগের গর্ব।

❍ **গবেষণা প্রসঙ্গে ঃ** অধ্যাপনার সাথে সাথে, ক্লাস নেবার পর ফাঁকা সময়ে বরাবরই আমি গবেষণা করে এসেছি এবং ছাত্র-ছাত্রীদের গবেষণা করিয়েছি। ২০০১-২০০৩ সালে আরামবাগ মহকুমা অঞ্চলের বিভিন্ন গ্রাম থেকে সংগৃহীত মধুর চাকে কী কী ফুলের পরাগরেণু (Pollen grains) পাওয়া যায়, সে বিষয়ে গবেষণা করার জন্য ইউ জি সি-র পৃষ্ঠপোষকতায় একটি মাইনর রিসার্চ প্রোজেক্ট "Melissopalynological investigation in Arambagh Sub-division of Hooghly District, West Bengal" আনি এবং কৃতকার্যতার সঙ্গে গবেষণালব্ধ ফলাফল জার্নালে প্রকাশ করি ও ইউ জি সি তে জমা দিই।

বাতাসে কোন্ অঞ্চলে কোন্ কোন্ ফুলের পরাগরেণু উড়ে বেড়ায় এবং ঐ পরাগরেণুগুলির কোন অঞ্চলে কত ফ্রিকোয়েন্সি সে সম্পর্কে জানার আগ্রহ আমার বরাবরের। ঐ পরাগরেণুগুলির বৈশিষ্ট্য কী? কোন পরাগরেণুগুলি মানুষের শরীরে এলার্জি ঘটায়? এই বিষয়ে ২০১২ সালে একটি মেজর রিসার্চ প্রোজেক্ট "Monitoring of Pollen incidence in the atmosphere of Hooghly District, West Bengal, with reference to allergic disorders" ইউ জি সি তে জমা দিই এবং ইউ জি সি প্রজোক্টটি অনুমোদন করে দেয়, সঙ্গে রিসার্চ করানোর জন্য একজন প্রোজেক্ট ফেলো (Research Scholar) দিয়ে দেয়। এই প্রোজেক্টে যোগদান করে Ph. D student পৃথা, পৃথা ভট্টাচার্য শাসমল এবং বেশ দক্ষতার সঙ্গে গবেষণা

সম্পূর্ণ করে বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পি. এইচ. ডি ডিগ্রি পায়। আর একজন পি. এইচ. ডি ছাত্রী সায়নী, সায়নী বিশ্বাস আমার কাছে এবং অধ্যাপক অম্বরীশ মুখার্জী, বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের স্যারের সাথে যৌথ পরিচালনায় রিসার্চের কাজ করে এবং বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পিএইচ. ডি ডিগ্রি লাভ করে।

❍ **সেমিনার ও ওয়ার্কশপ প্রসঙ্গে ঃ** প্রিন্সিপাল ড. অসীম কুমার দে'র অনুপ্রেরণাতে ২০১৭ সালে আমাদের বিভাগের সমস্ত অধ্যাপক-অধ্যাপিকা, শিক্ষাকর্মী ও ছাত্র-ছাত্রী সবাই মিলে একটি ইউ জি সি স্পনসর জাতীয় পর্যায়ের কর্মশালা 'খাদ্য সুরক্ষা'-র আয়োজন করা হয়। কর্মশালাতে মূল বক্তা হিসাবে উপস্থিত ছিলেন সেন্ট্রাল টিউবার ক্রপ রিসার্চ ইনস্টিটিউট আই. সি. এ. আর, ভুবনেশ্বরের প্রধান এবং প্রধান বিজ্ঞানী ড. অর্চনা মুখার্জী। কর্মশালা উদ্বোধন করেন ড. টি. কে. মাইতি, প্রধান, উদ্ভিদবিদ্যা বিভাগ, বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়। এই অনুষ্ঠানে চেয়ার পার্সনস ছিলেন প্রফেসর বি. কে. দত্ত, উদ্ভিদবিদ্যা বিভাগ, ত্রিপুরা বিশ্ববিদ্যালয়; প্রফেসর পি. কে. পাল এবং ড. রাজীব বন্দ্যোপাধ্যায়, উদ্ভিদবিদ্যা বিভাগ, বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়। "খাদ্য সুরক্ষা" - এই বিষয়ে বিশেষভাবে আলোচনা করেন রিসোর্স পার্সন প্রফেসর অলোক ভট্টাচার্য, প্রফেসর সৌমেন ভট্টাচার্য, ড. গৌতম সরকার এবং ড. জগৎপতি তা। কিছুদিন আগে উদ্ভিদবিদ্যা বিভাগের পুনর্মিলন অনুষ্ঠানে এসেছিলেন প্রফেসর সুব্রত রাহা, বিভাগীয় প্রধান সিধু কানু বিরসা বিশ্ববিদ্যালয়। উনি প্লাস্টিক ম্যানেজমেন্টের উপর আলোচনা করেন। এভাবেই আমাদের বিভাগের তথা কলেজের জ্ঞানচর্চা আলোকজ্জ্বল হয়েছে।

❍ **শিক্ষামূলক ভ্রমণ ঃ** আমাদের বিভাগের ছাত্র-ছাত্রীরা প্রত্যেক বছর উদ্ভিদের বৈশিষ্ট্য ও প্রকৃতি সম্পর্কে জ্ঞান আহরণের জন্য শিক্ষামূলক ভ্রমণ করে থাকে। আজ পর্যন্ত বিভিন্ন জায়গাতে শিক্ষামূলক ভ্রমণ করা হয়েছে এবং ছাত্র-ছাত্রীরা সেইসব জায়গার উদ্ভিদ জগৎ সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করেছে। ছাত্র-ছাত্রীরা বিভিন্ন জায়গাতে ফিল্ড ওয়ার্ক করেছে, যেমন - লাভা, লোলেগাঁও ও রিসপ্, দার্জিলিং, সিকিম, ডুয়ার্স, শিলং, গৌহাটী, রিনচেনপং, পেলিং, হরিদ্বার, দেরাদুন, মুসৌরী ও কন্যাকুমারী। এসব জায়গাতে বিশ্ববিদ্যালয় ও রিসার্চ ইনস্টিটিউটে আমাদের ছাত্র-ছাত্রীরা সেমিনারে অংশগ্রহণ করেছে। এভাবেই তাদের পড়াশোনার জ্ঞানভাণ্ডার সমৃদ্ধ হয়েছে।

পরিশেষে বলি ছাত্র-ছাত্রীরা শুধু পড়াশোনাই নয়, সংস্কৃতি চর্চাতেও অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছে। পড়াশোনা সম্পন্ন করে সমাজে সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছে। আমি ডিপার্টমেন্টের পক্ষ থেকে সকল ছাত্র-ছাত্রী বড়ো হোক, মানুষ হোক এবং সুপ্রতিষ্ঠিত হোক - এই কামনা করি। এর সাথে সাথে নেতাজী মহাবিদ্যালয়ের উত্তরোত্তর সমৃদ্ধি প্রার্থনা করি।

আমার কলেজ ও আমার বাংলা বিভাগ
সুমিতা রানী দাস

এক-দুই-তিন করে আমার প্রিয় নেতাজী মহাবিদ্যালয় আজ ৭৫বছর পূর্ণ করল। যে কলেজ একদিন গুটি কয়েক ছাত্র নিয়ে যাত্রা শুরু করেছিল, তা আজ কয়েক সহস্র ছাত্র-ছাত্রীর কলতানে মুখরিত। যে কলেজের বীজ সুপ্ত হয়েছিল ১৯৪৮ সালের আগষ্ট মাসের প্রথমদিন, তা আজ পত্র-পুষ্পে পল্লবিত হয়ে বিরাট মহীরূহ রূপ ধারণ করেছে। দিকে দিকে ছড়িয়ে পড়েছে তার যশ সৌরভ।

আমি বাংলা বিভাগে অধ্যাপনার কাজ করি। এই বাংলা বিভাগও এক-দুই-তিন করে আজ ৭৫ বছর পূর্ণ করল। শুরু থেকে এই কলেজে সাফল্যের সাথে বাংলা পড়ানো হয়ে আসছে। প্রথম এই বিভাগের অধ্যাপক নিযুক্ত হয়েছিলেন নন্দলাল প্রামাণিক মহাশয়। তিনি যখন পড়াতেন তখন স্নাতক স্তরে পড়ানা শুরু হয়নি। শুধু ইন্টারমিডিয়েট স্তরে পড়ানো হতো। তারপর ১৯৫৭ সালে এই কলেজ স্নাতক পড়ানোর অনুমতি পায়। তখন স্নাতকের সাধারণ স্তরে বাংলা পড়ানো হতো। সেই সময় এই কলেজ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে ছিল। ১৯৬০ সালে বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হলে এই কলেজ তার অধীনে যায়। ১৯৬৩ সালে এই কলেজ বাংলা অনার্স পড়ানোর অনুমতি পায়। মুক্তারাম চট্টোপাধ্যায়, সরোজ রায়, শৈলেন চক্রবর্তী এবং প্রেমানন্দ চ্যাটার্জী - এই চারজন ছাত্রকে নিয়েই নেতাজী মহাবিদ্যালয়ের সাম্মানিক বাংলা বিভাগ যাত্রা শুরু করে। এই সময় অধ্যাপনার কাজে নিযুক্ত ছিলেন অম্বুজ বসু মহাশয়, রমাপ্রসাদ ঘোষ মহাশয় এবং রবীন আদক মহাশয়।

এই বিভাগের প্রথম অধ্যাপক নন্দলাল প্রামাণিক মহাশয় ১৯৫০-এর দশকের শেষ দিকে এই কলেজের স্থায়ী পদ ছেড়ে অন্যত্র চলে গেলেও সপ্তাহে দু'দিন এই কলেজে পড়াতে আসতেন। নন্দলালবাবুর জায়গায় আসেন বিশিষ্ট জীবনানন্দ সমালোচক 'একটি নক্ষত্র আসে' গ্রন্থের লেখক অম্বুজ বসু মহাশয়। এই বছরই বিভাগের দ্বিতীয় পদ সৃষ্টি হলে সেই জায়গায় আসেন রবীন আদক মহাশয়। তারপর বিভাগের তৃতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চম পদ সৃষ্টি হলে অধ্যাপনার কাজে নিযুক্ত হন রমাপ্রসাদ ঘোষ মহাশয়, মুরারি মোহন মান্না মহাশয় এবং শ্যামসুন্দর বীট মহাশয়। ১৯৮৭ সালে শ্যামসুন্দর বীট মহাশয় অন্যত্র পড়াতে চলে গেলে সেই জায়গায় অধ্যাপনার কাজে নিযুক্ত হন অজিত বেরা মহাশয়।

রবীন আদক মহাশয় অবসর গ্রহণ করলে ১৯৯৫ সালে আমি এই কলেজে অধ্যাপনার কাজে নিযুক্ত হই। তখন বাংলা বিভাগের অধ্যাপনার কাজ করছিলেন অম্বুজ বসু মহাশয়, রমাপ্রসাদ ঘোষ মহাশয়, মুরারি

* বিভাগীয় প্রধান, বাংলা বিভাগ

মোহন মান্না মহাশয় এবং অজিত কুমার বেরা মহশয়। এই সময় বিভাগীয় প্রধান ছিলেন অম্বুজ বসু মহাশয়। অম্বুজ বসু মহাশয়ের লেখা 'একটি নক্ষত্র আসে' গ্রন্থটি অনেক আগে পড়েছি। জীবনানন্দের উপর লেখা এই অসাধারণ গবেষণামূলক গ্রন্থটি পড়ে বারবার মুগ্ধ হয়েছি, কিন্তু কোনদিন ভাবিনি এই লেখকের সঙ্গে একদিন সাক্ষাত পরিচয় হবে এবং তাঁরই ছত্রছায়ায় থেকে আমি কাজ করার সুযোগ পাবো।

মনে পড়ে কলেজের প্রথম দিনের কথা - তিনি আমাকে ক্লাসে ছাত্র-ছাত্রীদের সঙ্গে পরিচয় করাতে নিয়ে গিয়েছিলেন। প্রসঙ্গক্রমে তিনি বলেছিলেন - এই প্রথম আমরা আমাদের বিভাগে কোন মহিলা অধ্যাপককে পেলাম। ক্লাসে ছাত্র সংখ্যা প্রচুর ছিল। খালি গলায় পড়াতে হতো। তাই বলেছিলেন - "কী পড়াচ্ছো সেটা বড় নয়, কত জোরে পড়াচ্ছো সেটাই বড় কথা।" তাঁর এই কথার মর্মার্থ আমি পরে বুঝেছি।

আমি যখন এই কলেজে আসি তখন কলেজে উচ্চমাধ্যমিকের ক্লাস হতো। বিজ্ঞান বিভাগ, বাণিজ্য বিভাগ এবং কলা বিভাগের বাংলা ক্লাস একসঙ্গে হতো। স্নাতক বাংলা সাধারণ স্তরের ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা প্রায় ৩০০ জনের মতো ছিল। এইসব ক্লাসে তখন মাইক্রোফোনের ব্যবস্থা ছিল না, খালি গলায় পড়াতে হতো। আবশ্যিক বাংলা এবং পাস বাংলায় ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা অনেক বেশি হওয়ায় খালি গলায় পড়াতে বেশ অসুবিধাই হতো। জোরে না পড়ালে পেছনের দিকে বসে থাকা ছাত্র-ছাত্রীরা কিছুই শুনতে পেত না। অনার্সে খালি গলায় পড়াতে কোন অসুবিধা হতো না। কারণ তখন বাংলা অনার্স পড়ার জন্য ৫০-৫৫ জন ছাত্র-ছাত্রী সুযোগ পেত।

আজও মনে পড়ে সেদিনের কথা। আমাদের অনার্সের ক্লাস হতো কলেজ মাঠের পশ্চিমদিকে টিনের ছাউনি দেওয়া ঘরে। একদিন আমি পড়াচ্ছি, এমন সময় আমার মাথার উপর খসে পড়ল মাটিসহ বেশকিছু উইপোকা। আচমকা কিছু মাথার উপর পড়ে যেতে চমকে উঠলাম, ব্যাঘাত ঘটলো পড়ানোয়। মাথার ওপর আশ্রয় পেয়ে তারা হয়তো আমাকে তাদের খাদ্যবস্তু ভেবে কামড়াতে শুরু করল। আমি কী করব, ঠিক করতে পারছি না, এমন সয় দুজন ছাত্রী ছুটে এলো আমাকে সাহায্য করতে। শুধু একদিন নয়, এইরকম ছোটো ছোটো নানা সমস্যায় আমাদের মাঝে মাঝে পড়তে হতো।

আমি এই কলেজে যোগদানের দু-এক বছরের মধ্যে রমাপ্রসাদবাবু, অম্বুজবাবু ও মরারিবাবু অবসর গ্রহণ করেন। ১৯৯৬ সালে অধ্যাপনার কাজে যোগ দেন ড. সুব্রত চট্টোপাধ্যায় মহাশয়। ১৯৯৭ সালে অধ্যাপনার কাজে যোগদান করেন ড. অর্চন চট্টোপাধ্যায় মহাশয়। ২০০১ সালে অজিতবাবু অন্য কলেজে চলে গেলে বিভাগীয় প্রধানের দায়িত্ব পালন করতে হয় আমাকে। ২০০১ সালে অধ্যাপনার কাজে যোগ দেন প্রদীপ কুমার পাল মহাশয়। সেই বছরই অরুণিমা চট্টোপাধ্যায়ও এই কলেজে অধ্যাপনার কাজে যোগ দেন। দীর্ঘদিন তারা দক্ষতার সঙ্গে বিভাগের সমস্ত দায়িত্ব পালন করেছেন। ২০০৮- এ সুব্রতবাবু অন্য কলেজে যোগদান করলে

সেই জায়গায় আসেন ড. টুনুরানী বেরা।

২০০৮ সালে বাংলা বিভাগের মুকুটে যুক্ত হল আর একটি পালক। বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় নিয়মিত বাংলা বিষয়ে স্নাতকোত্তর পাঠদানের অনুমতি দিল। এই স্তরেও ছাত্র-ছাত্রীর আসন সংখ্যা ক্রমশ বেড়ে চলেছে। দক্ষিণবঙ্গ থেকে উত্তরবঙ্গ অর্থাৎ বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় ছাড়াও অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ছাত্র-ছাত্রীরা এখানে স্নাতকোত্তর বিষয়ে পড়তে আসছে।

দিন বদলেছে, বদলেছে সময়। আজ আর কলেজে পাঠকক্ষ হিসাবে টিনের বা টালির ছাওয়া ঘর খুঁজে পাওয়া যায় না। বর্তমান অধ্যক্ষ ড. অসীম কুমার দে মহাশয়ের নেতৃত্বে কলেজের আমূল পরিবর্তন ঘটেছে। মাঠের ধারে আমাদের অনার্সের ক্লাস যেখানে হতো, সেখানে এখন বহু কক্ষবিশিষ্ট বৃহৎ অট্টালিকা, তার দ্বিতলে রয়েছে আমাদের বাংলা বিভাগ। রয়েছে বিভাগীয় গ্রন্থাগার এবং সেখানে পাঠ উপযোগী নানা বই সজ্জিত রয়েছে। অধ্যাপক থেকে ছাত্র-ছাত্রী প্রত্যেকেই এই বই পড়ে নিজেদের অনেকটা সমৃদ্ধ করেন। রয়েছে ছাত্র-ছাত্রীদের তৈরি দেওয়াল পত্রিকা 'সিসৃক্ষা'। নানা বর্ণে চিত্রিত হয়েছে বিভাগের দেওয়াল, যাতে বর্ণিত হয়েছে সূচনাপর্ব থেকে বর্তমান কাল পর্যন্ত বাংলা সাহিত্যের বিবর্তনের ইতিহাস।

অধ্যাপকদের বসার জন্য আগে একটি মাত্র ঘর বরাদ্দ ছিল। আজ প্রত্যেকটি বিভাগের জন্য আলাদা আলাদা করে ঘর বরাদ্দ হয়েছে। যার ফলে বিভাগের ছাত্র-ছাত্রীরা সহজে অধ্যাপকদের কাছে গিয়ে তাদের সুবিধা ও অসুবিধার কথা যেমন বলতে পারে তেমনি ক্লাসে পড়া কোথাও বুঝতে না পারলে আলাদা করে সেই বিষয়টি অধ্যাপকদের কাছ থেকে জেনে নিতে পারে সহজেই।

২০১৭ সালে টুনুরানী বেরা অন্য কলেজে চলে গেলে তাঁর জায়গায় আসেন অধ্যাপিকা মমতা খান। ২০২১ সালে অধ্যাপিকা অরুণিমা চট্টোপাধ্যায় যিনি প্রায় কুড়ি বছর দক্ষতার সঙ্গে এই বিভাগের সমস্ত দায়িত্ব পালন করেছিলেন, তিনিও অন্য কলেজে চলে গেলেন।

অল্প কয়েকটি বিষয়, কয়েকজন শিক্ষক, শিক্ষাকর্মী ও কয়েকজন ছাত্র-ছাত্রী নিয়ে যে কলেজের যাত্রা শুরু হয়েছিল, সেই কলেজে আজ চব্বিশ বিষয় পড়ানো হয়। অনার্স পড়ানো হয় একুশটি বিষয়ে। এম. এ. পড়ানো হচ্ছে বাংলা বিষয়ের উপর। পড়ানো হচ্ছে বি.বি.এ., বি.সি.এ.-র মতন বিষয়। সময়ের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে এখানে কম্পিউটার সায়েন্স পড়ানো হয়। নেতাজী সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় ও ইন্দিরা গান্ধী জাতীয় মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ানোর ব্যবস্থা এখানে আছে। ছেলে-মেয়েদের কর্মসংস্থানের কথা ভেবে তাদের আলাদা করে ট্রেনিং দেওয়া হয়। ক্যাম্পাসিং-এর ব্যবস্থাও করা হয়েছে এখানে।

আমি গর্বিত, আমি আনন্দিত এই কলেজের অন্তরজন হতে পেরে। যে কলেজ একদিন প্রতিবেশী দেশহিতৈষী সত্যেন্দ্রনারায়ণ আঢ্যদের ঘরে তার যাত্রা শুরু করেছিল, সময়ের বিবর্তনে ও উপযুক্ত কর্মকর্তার

প্রচেষ্টায় তা আজ নিজস্ব বৃহৎ কলেবর নিয়ে স্বমহিমায় পূর্ণ বিকশিত। আজ দিকে দিকে ছড়িয়ে পড়েছে তার সৌরভ, সুরভী। আনন্দের সঙ্গে বলা যায়, এই বছরই আমাদের কলেজের বাংলা বিভাগের ছাত্র সূর্য মুখার্জী আন্তর্জাতিক স্তরে যোগায় (Yoga) অংশগ্রহণ করে বিজয়ী হয়েছে, লাভ করেছে স্বর্ণপদক। দেশ-বিদেশে নানা জায়গায় আমাদের কলেজের ছাত্র-ছাত্রীরা নানা গুরুত্বপূর্ণ কাজে যুক্ত হয়ে আমাদের কলেজকে মহিমান্বিত করে তুলেছে। আজ এই কলেজের ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা পাঁচ হাজার ছাড়িয়ে গেছে এবং প্রতিবছর একশোর বেশি ছাত্র-ছাত্রী বাংলা অনার্স পড়ে। সাধারণ বাংলা পড়ে প্রায় তেরো থেকে চোদ্দোশো ছাত্র-ছাত্রী। আজ আর গুটিকয়েক নয়, শত-সহস্র ছাত্র-ছাত্রীর কলরবে মুখরিত এই কলেজ।

এই বিভাগে এখন আমরা ১০ জন অধ্যাপনার কাজ করি। যেমন ড. অর্চন চট্টোপাধ্যায়, প্রদীপ কুমার পাল, মমতা খান, আভা দে, পীযুষ বেরা, রাজকুমার প্রামাণিক, কৃষ্ণচন্দ্র মণ্ডল, ড. সুদীপ্ত নায়েক, বিশ্বজিৎ বিশ্বাস এবং আমি। আমার কাছে সবচেয়ে আনন্দের এই যে, এর মধ্যে ৬ জন আমার ছাত্র-ছাত্রী, যারা আজ আমার সহকর্মী। প্রত্যেকেই এই বিভাগে দক্ষতার সঙ্গে কাজ করে চলেছে।

এই বিভাগের ছাত্র-ছাত্রীরা কেউ কলেজে পড়ায়, কেউ বা পড়ায় স্কুলে। কেউ শিক্ষক, কেউ বা দক্ষ প্রশাসক, কেউ প্রতিবেদক, কেউ বা বিচারক, কেউ গায়ক, কেউ বা সাহিত্যিক। আবার কেউ শিল্প ভাস্কর্যে খ্যাতি অর্জন করেছে। দেশে-বিদেশে নানা জায়গায় নানা কাজে দক্ষতার পরিচয় দিয়েছে এই বিভাগের ছাত্র-ছাত্রী। সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতায় কলেজে সেরার সেরা হয়েছে এই বিভাগ। এই বিভাগের ছাত্র আন্তর্জাতিক স্তরে শ্রেষ্ঠত্বের পরিচয় দিয়েছে।

আমি গর্বিত, আমি আনন্দিত, আমি আপ্লুত এই ভেবে যে, এই কলেজের বয়স যখন ৫০ বছর, তখনও আমি এই কলেজে ছিলাম, আজ এই কলেজের বয়স ৭৫ পূর্ণ হলো, আজও আমি এই কলেজের প্ল্যাটিনাম জুবিলি বর্ষ পালন করছি। এরচেয়ে আনন্দের আর কী হতে পারে! এই কলেজের সবচেয়ে বড় সম্পদ হল ছাত্র সমাজ। যারা পঠন-পাঠন ছাড়াও নানা সামাজিক কর্মের সঙ্গে যুক্ত হয়ে দক্ষতার পরিচয় দিয়ে এই কলেজের শ্রীবৃদ্ধিতে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছে।

যে কলেজ একদিন মন্থরগতিতে এগিয়ে ছিল, কালের বিবর্তনে, ছাত্র-ছাত্রীর সাফল্যে তা আজ শত সহস্র ধারায় বিকশিত। মনে হয় চাকার যুগ অতিক্রম করে তা আজ জেট বিমানের যুগে উপনীত। এই কলেজের উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি কামনা করি, কারণ আমার কাছে এই কলেজ দেবমন্দির, ছাত্রসমাজ এই মন্দিরের দেবতা, তাদের পড়ানো আমার পূজা। এই কলেজ যেমন আমার মান, তেমনই এই ছাত্রসমাজ আমার প্রাণ।

৭৫ এ পা ঃ দ্বারকেশ্বরের জলতরঙ্গে

উদয় নন্দী

কীভাবে শুরু করি? শুরুটাতেই তো শেষের অভিঘাত। না, হয়তো নক্ষত্রপতন নয়। কিন্তু প্রতিটা চলে যাওয়াই যে হৃদয়-বিদারক। যে কয়েকজনকে সঙ্গে নিয়ে ডিপার্টমেন্টের সাম্মানিক স্তরের কাজকর্ম শুরু করেছিলাম, তাদের মধ্যে একজন অনন্ত (দা) সরকার। এখন ডিপার্টমেন্ট-এ 'ছবি' হয়ে আছেন। উৎসব-অনুষ্ঠানে ফুল-মালা দিয়ে স্মরণ করি। চোখ ভিজে যায়, আবার চোখ মুছে নিয়ে কাজে হাত দিই। জীবনের অমোঘ নিয়ম।

সত্যিই দাদার মতো স্নেহ-ভালবাসা দিয়ে আগলে রাখতেন, সুপরামর্শ দিতেন। ধীরে ধীরে ঘরোয়া সম্পর্কে জড়িয়ে গিয়েছিলাম। কিন্তু ঈশ্বর অকালে কেড়ে নিলেন। গরীব হয়ে গেলাম আমরা।

সময় পেরিয়ে যায়। দ্বারকেশ্বর দিয়ে অনেক জল গড়িয়ে যায় স্বাভাবিক নিয়মে। এদিকে জীবনের পরিহাসে স্বজন হারানোর ক্ষত শুকাতে না শুকাতেই আবার আঘাত। হঠাৎ বিনা নোটিশে চলে গেল বিভাস (প্রামাণিক)। বিভাগের প্রথম সাম্মানিক স্নাতক। লেবার (Labour) ডিপার্টমেন্টে চাকরি করতো পশ্চিমে। উপরি পাওনার ডিপার্টমেন্ট। মাঝে মাঝে নিজের dilemma-র কথা বলতো। একদিকে নেওয়ার জন্যে কঠিন অফার, অন্যদিকে আমাদের (আমি, অনন্তদা এবং রাজীবদা, যাঁর কথায় পরে আসবো) আদর্শ। জিতেছিলো ও। জেতার জেদ ছিল যে ওর। সিলেবাসের পড়াশোনায় চৌখশ না হলেও সাহিত্য (বাংলা এবং ইংরাজী) টা বুঝতো। কিন্তু সিলেবাসের বাইরে গভীর জ্ঞান। Competitive পরীক্ষায় সাফল্যের সঙ্গে উত্তীর্ণ হয়েই তো ঐ চাকরি। এমনি এমনি নয় যে ওকে আমাদের কলেজের UGC approved Entry in Service-এর কোচিং-এ (যার কো-অর্ডিনেটর ছিলাম আমি) জেনারেল নলেজ (GK) এবং জেনারেল ইন্টেলিজেন্স (GI)-এর কাউনসেলার করা হয়েছিল এবং প্রত্যাশিতভাবেই অল্প কিছুদিনের মধ্যেই নিজের Performance-এ নিজেকে প্রমাণ করে ও ছাত্র-ছাত্রীদের কাছে জনপ্রিয় হয়েছিল। তারপর ছন্দপতন। অরন্ধন (আরাঁধ) উপলক্ষে মায়ের ডাকে সাড়া দিয়ে বাড়ি ফিরতে গিয়ে বাঁকুড়ার বাড়ীকুল-এ 'ভৈরব বাঁকি' নদীর হড়পা বানে বাস ডুবে ...। একদিন পর ফোলা, পচা, গলা দেহটা পাওয়া গিয়েছিল প্রায় ন'কিলোমিটার দূরে একটা বেনাঝোপে। মনে পড়ে যাচ্ছিল J. M. Synge-এর Riders to the Sea নাটকে নায়ক Bartley-র নিয়তির কথা। কিছুদিন আগেই কলেজে একবার দেখা হয়। কথা হচ্ছিল আমার পেটের কঠিন সমস্যা নিয়ে। তো ও বলেছিল, ''স্যার আপনি এইটুকু সমস্যায় এত টেনশন করছেন, আর আমরা যে ট্রেনে, বাসে, দূর, দূরান্তে ঘুরে বেড়াই, কখন

* অধ্যাপক, ইংরাজী বিভাগ

কী হয়ে যেতে পারে, বলুন তো?" নিয়তির কী পরিহাস!

আর সেই পরিহাসের টানেই কয়েক বছর পর সুখেন (নন্দী), জয়ন্ত ঘোষ, বর্তমান বিভাগীয় প্রধান, ইংরাজী বিভাগ, কামারপুকুর শ্রীরামকৃষ্ণ সারদা বিদ্যা মহাপীঠ এর ব্যাচমেট। কী obedient ছাত্র সব, কী বন্ধুপ্রীতি, বইপ্রেম! নিজেরই গ্রামে টিউশন পড়িয়ে ফেরার পথে মোটর সাইকেল এ্যাকসিডেন্টে - ঘটনার বর্ণনা দিতে গিয়ে সাহিত্য বিলাসকে অপরাধ মনে হয়। শুধু মনে পড়ে (প্রায়) দেহহীন চোখ শেষবারের মতো বোজার আগে "জল, জল, বাঁচতে চাই, বাচ্চাটাকে যে ..." বাক্যটাকে শেষ করতে পারেনি।

ব্যাচের পর ব্যাচের মিছিল এগিয়ে গেছে। এদিকে মৃত্যু মিছিলে নবতম সংযোজন, অনুষ্টুপ এবং তারপর বৃতি সামন্ত - বুল্টি, তন্ময়, সৌরভ, সুস্মিতা, সুমন্ত, স্বর্ণ (প্রভা)-র ব্যাচমেট। যে ব্যাচই ইংরাজী বিভাগে প্রথম 'শিক্ষক দিবস' পালন চালু করে, যে ব্যাচই প্রথম আমাকে বাৎসরিক বনভোজন (Picnic) করতে প্রেরণা জোগায়। যার ফলশ্রুতিতে আজ প্রায় সতেরো বছর চলছে আমার বাৎসরিক বনভোজন (যদিও Privately), কিন্তু কলেজের বিভিন্ন Year-এর ছাত্র-ছাত্রীরা যোগ দিয়ে এটিকে বাৎসরিক পুনর্মিলনে পরিণত করেছে। Programme টির অন্তত মাসখানেক আগে থেকে সবার সাড়া পড়ে যায়, পুজো আসছে আসছের মতো। তারপর ঐ দিনটিকে আমরা 'drink to the lees', কিন্তু দিনশেষে মনটা বড়ো ফাঁকা হয়ে যায়। তাই এই Programme টির নাম দিয়েছি "একটি পরিকল্পিত বাৎসরিক মন খারাপের দিন"।

তো এই শাখা থেকেই একদিন খসে পড়লো ... না 'বৃতি' তো নয়, দলমণ্ডল নিয়ে সকালে ফোটা সাক্ষাৎ একটা সাদা গোলাপ। কিন্তু তাতে ধরলো মারণ কীট এবং ... ওদের তো যাবার কথা ছিলো না এখন? আসলে -

"এখন উঠেছে এক হাওয়া
পরে এসে আগে চলে যাওয়া"

আর এই আগে চলে যাওয়ার ভীড়ে আরেকজন। নাজির (খান)। কলেজ (অফিস) এর অত্যন্ত পরিচিত মুখ। পড়াশোনা যদি মঞ্চে অভিনয় হয়, পর্দার আড়ালে (স্টেজ, লাইট, সাউন্ড ইত্যাদির দায়িত্বে থাকা) কিছু মানুষ না থাকলে, সে অভিনয় কখনই সুসাফল্যমণ্ডিত হয় না। নাজির এই মানুষগুলোর অন্যতম, এখন সে জায়গাটায় দেখতে পাই অনিন্দ্য এবং কিছুটা হলেও মৌমিতাকে। 'করোনা' কালে এবং 'করোনা' কালের বাইরে অফিসে এবং আক্ষরিক অর্থে 'work from home' যাকে বলে, সেই কাজ দিন-রাত্রি এক করে কলেজের প্রশাসনিক, এ্যাকাডেমিক এবং 'Students' Progression-এর দিকটিকে সবসময় সচল রাখতে আমৃত্যু চেষ্টা করে গেল স্বাস্থ্য-সুঠাম ছেলেটি। তবে কাজকে শুধুমাত্র 'Professional Duty' কথাটার মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখলে তার প্রতি সুবিচার করা হবে না কোনোদিন।

আসলে কিছু কিছু মানুষের কলেজটির প্রতি অবদান কখনই বৈষয়িক মুল্যে মাপা যায় না। যেমন - সবুজবাবু, পরেশবাবু এবং উদয়বাবু (পরপর আমার পাওয়া তিনজন প্রধান করণিক)। তৃতীয় জনের কথা আর কী বলবো? শুধু সারাজীবন মনে থাকবে ২০১৫ সালের NAAC Visit (2nd Cycle) এর প্রস্তুতি পর্বে উনি পুরী বেড়াতে গেছেন সপরিবারে। সেখানেই জ্বালিয়ে মেরেছি, এটা-ওটা তথ্যের তাগাদায়। কখনই বিরক্ত হননি। ধীর, শান্তভাবে তথ্য সরবরাহ সহ অন্যান্য সকল কাজকে সহজে সেরেছেন। এ ব্যাপারে তিনি তাঁর পুর্বসুরী সবুজবাবুর যোগ্য উত্তরসুরী।

এছাড়া পেয়েছি শ্রীকান্ত পাত্র, শ্রীকান্ত বিশ্বাস, সুশান্ত কুণ্ডু। এরমধ্যে প্রথম এবং তৃতীয় জন তো আমার (কলেজের) কাজে, অকাজে, সুখে-দুঃখে সর্বক্ষণের সঙ্গী। তারপর অলোক (বেতাল) দা, সুব্রত (মজুমদার) দা, বিবেকানন্দ (সরকার) দা, প্রণবদা (প্রণব দাস, কলেজের সব উৎসব-অনুষ্ঠানের শিল্প কর্মের নেপথ্যে), নুপুরদি, আল্পনাদি, পরেশ ভাই, লামা ভাই, চৈতালীদি, শুকদেব, স্বপনদা, সান্ত্বনা, রাজু, রাজকমল, মধুমিতা এবং অবশ্য অবশ্যই 'মামা' (নিরঞ্জন)। ভোর থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত কলেজের এটা-ওটা করে, কলেজকে ভালবেসে আগলে রাখেন। কলেজের 'বাঞ্ছারাম', আমাদের 'ভরসা'।

আর আমাদের সকলের মাথার উপর বটগাছের মতো ছাতা হয়ে আছেন শঙ্করবাবু। রিটায়ার করার পরেও এই ৭৫ বৎসর (ঘটনাক্রমে কলেজেরও ৭৫ বৎসর পূর্ত্তি চলছে) বয়সে নীরবে, নিরলস পরিশ্রম করে চলেছেন অফিসের সেই চেনা টেবিলটিতে। আমাদের সকলের অভিভাবক। 'কথা কম কাজ বেশি' নীতির মানুষ, যেমন খানিকটা বিবেকদা।

এই মানুষগুলো না থাকলে কলেজ উল্লেখযোগ্য Staff Shortage সত্ত্বেও দ্রুতগতিতে এগোতে পারত না। অথচ এঁরা lime light-এ আসেন না, সব আলোটাই পড়ে শিক্ষক-শিক্ষিকাদের মাথায়। কবিগুরুর ভাষায় - "ফুলগুলি যেন কথা / পাতাগুলো যেন চারিদিকে তার পুঞ্জিত নীরবতা"।

শুকদেব-এর কথা আগেই বলেছি। কিন্তু ওর সম্বন্ধে একটা বিশেষ কথা না বললে অকৃতজ্ঞতার পরিচয় দেওয়া হবে। SLET (এখন SET) এ উত্তীর্ণ হয়ে C.S.C তে empanelled হয়েছি। তখন বর্ধমানের একটা মেসে কিছুদিন একসাথে ছিলাম। কথা প্রসঙ্গে একদিন বললো - "দাদা, আমাদের কলেজে আসতে চান? তাহলে স্যারকে (বিজয়কৃষ্ণ ঘোষ, তৎকালীন অধ্যক্ষ) ...।" ঈশ্বরের যোগাযোগ ছাড়া কী বলবো?

নিঃসঙ্কোচে সায় দিলাম। পরে একদিন শুকদেব কলেজে পরিচয় করাতে নিয়ে এলো। স্যার (ল্যান্ড) ফোন তুললেন সি. এস. সি-র চেয়ারম্যানকে এক ব্যারিটোন (যেটা পরে বুঝেছিলাম ওনার সিগনেচার) - "স্থানীয় ছেলে college-এর প্রতি তো একটা special commitment থাকবে, না কী?" জানি না ও প্রান্তের response কী ছিল। কিন্তু তারপর তো ... শুধু জানি না এই commitment এর কতটা পালন করতে পেরেছি,

কতটাই বা ওনাকে খুশি করতে পেরেছি।

এই কলেজে appointment letter পাওয়ার নেপথ্যে আরো একজনের নাম না করলে ভুল হবে। তিনি আমার তখনকার অভিভাবকতুল্য কয়েকজনের মধ্যে একজন। মনিমোহন নন্দী। মনিবাবু। কর্মাসের বিভাগীয় প্রধান। 'স্যার' বলে ডাকতাম। যেমন এখনকার জুনিয়াররা আমাদের সিনিয়ারদের আন্তরিক শ্রদ্ধার সঙ্গে ডাকে। যাইহোক, মনিবাবুই সি. এস. সি অফিসের একজন non-teaching staff-এর সঙ্গে যোগাযোগ করিয়ে দিয়ে বিজয়বাবুর সুপারিশে এই কলেজে পড়ানোর সুযোগটার পাকাপাকি ব্যবস্থা করে দেন। ওনাদের সকলকে সশ্রদ্ধ প্রণাম এবং শুকদেবের জন্য আন্তরিক শুভেচ্ছা রইলো।

প্রসঙ্গত, প্রয়াত বিজয়বাবু আমার প্রথম প্রাতিষ্ঠানিক কর্তা, যাঁর আন্ডারে বেশ কয়েকবছর কাজ করেছি। রাশভারী মানুষ হিসাবেই সকলের কাছে পরিচিত। কিন্তু মাঝে মাঝে কাছে গিয়ে দেখা গেছে, আপাত কঠিন মানুষটির আড়ালে একটা নরম সত্ত্বাও ছিল, নারকেলের শাঁস-এর মতো। তখন weekend-এ দাঁইহাট চলে যেতাম। এই দাঁইহাট নদীয়ার নবদ্বীপের কাছাকাছি। নবদ্বীপে আগে স্যার অধ্যাপনা করেছেন। আর ওখানে থাকতেন নবদ্বীপ বকুলতলা স্কুলের অঙ্কের শিক্ষক, আমার গ্রামের (ছোট বৈনান) ছোটবেলাকার প্রাইভেট টিউটর। সেই সূত্রে দুজনের আলাপ ছিল। এই স্যার আবার সম্পর্কে আমার স্ত্রীর নিজের মাসতুতো দাদা। তো মিসেস তখন দাঁইহাট পি. এইচ. সি-তে কাজ করতো। আরামবাগে ট্রান্সফার হয়নি। তখন সপ্তাহে দুদিন করে off day (এখনকার ভাষায় Preparatory day) থাকতো। তো শনিবার ক্লাস সেড়ে ওখানে চলে যেতাম, রবি-সোম (off day) কাটিয়ে আবার মঙ্গলবার এসে ক্লাস ধরতাম। একদিন ট্রেন-বাসের গোলমাল থাকাতে ক্লাসের নির্ধারিত টাইমেরও এক-দেড় ঘন্টা বাদে কলেজে ঢুকেছি। এদিকে উনি তখনও স্টাফরুমে অন্য স্যারেদের সঙ্গে বসে (নিজের চেম্বারে তখনও যাননি)। তাই সই করতে গিয়ে 'যেখানে বাঘের ভয় সেখানে ...'। আমি দরদর করে ঘামছি। এক ভোর থেকে উঠে journey-র ধকল, তারপর আবার এই মানসিক টেনশন। তো উনি আমার দিকে তাকিয়ে হাসিমুখে বললেন, "কী সাহেব (উনি আমাকে স্নেহ ভরে ঐ নামেই ডাকতেন), চোখ-মুখ তো একেবারে শুকিয়ে গেছে দেখছি। আগে স্নান, খাওয়া সারো, তারপর ক্লাসে যাবে'খন।" তারপর গটগট করে হাঁটা দিলেন নিজের চেম্বারের দিকে। আমার ঘাম দিয়ে জ্বর ছাড়লো।

ইতিহাসের লোক হয়েও ইংরাজী লেখার মুন্সিয়ানায় ওনার কাছে সবসময় লজ্জা পেয়ে এসেছি। সুন্দর সুন্দর ড্রাফটিং কয়েকটা সিগারেটের টানে সেড়ে ফেলতেন। মাঝে মাঝে বলতেন, "দ্যাখো কোনো change করতে হবে না কি?" change তো করতে পারিই নি, বরং লুকিয়ে লুকিয়ে অনেক expression শিখে নিয়েছি। মাঝে মাঝেই E. M. W. Tillyard এর কী কী বই পড়েছি জানতে চাইতেন। অবাক হয়ে ভাবতাম, না খাপ খোলাই ভাল, এখুনি ল্যাজে গোবড়ে হয়ে যাবো। তবে একবার খুব মজা হয়েছিল। কী

একটা serious ব্যাপারে একটা notice করেছিলেন। আমি notice টা violate করেছিলাম। চেম্বারে আমাকে ডেকে পাঠিয়ে, গম্ভীর মুখে বললেন, "Et tu সাহেব!" Wit টা প্রথমে ধরতে পারিনি। বললেন, " আরে notice টার কথা বলছি।" টিপ্পনীটা বেশ লাগলো, তবে এ যাত্রায় দুর্গতিনাশিনী বাঁচিয়ে দিলেন। বললাম, "স্যার আসলে notice টা escaped my notice।" ঠোঁটের কোণে হাসি চেপে বললেন, "তোমাকে নিয়ে আর পারলাম না সাহেব। নাও চা-টা তো খাও।"

স্যারের আমলে একঝাঁক তরুণ অধ্যাপক/অধ্যাপিকা জয়েন করেছিল। যেমন ওনার জামাতা তিলক (ঘোষ), সুব্রতদা (চট্টোপাধ্যায়), অজয়, অমিত, অর্চন, অরুনিমা, সুমিতাদি, বিনয়, অনিন্দ্যদা, পরে বিশ্বনাথ (বর্তমান ভাইস প্রিন্সিপ্যাল), সোনালী, অনিন্দা। অনিন্দা ভট্টাচার্য। আমার থেকে বয়সে অনেক জুনিয়ার। কিন্তু চর্চায় অনেক পরিণত। শুধু নিজের বিষয় Economics-এ নয়, সাহিত্য, সঙ্গীত, সমাজতত্ত্বে অফুরন্ত জ্ঞানের অধিকারী। মার্জিত রুচি, স্মিত হাস্য মেয়েটিকে আমার পাশে অনেক ভাবে পেয়েছি। আমার অনেক manuscript নিয়ে type করে দিয়েছে, আমার বেশ কয়েকটা article বড়ো বড়ো journal-এ পাঠিয়ে দিয়েছে (যা পরে প্রকাশিত হয়েছে)। আমার "Translation Studies" এর বই লেখার সময় অনেক মূল্যবান material জোগাড় করে দিয়ে সহযোগিতা করেছে। ওর সঙ্গে সাক্ষাৎ এবং text sharing-এ যে কত সুন্দর সুন্দর বিষয় শিখে সমৃদ্ধ হয়েছি তা বর্ণনাতীত। আমার লেখাজোখায় এবং আচরণকে সময়ে সময়ে edit করে দিয়ে আমাকে ভেঙেচুরে তৈরি করার পথে ওর অবদান কখনও ভোলবার নয়। এদের প্রত্যেকের সঙ্গে সৌহার্দের বন্ধনে পথ চলতে কোনো অসুবিধা হয়নি। বরং পারস্পরিক ভাব বিনিময়ে সমৃদ্ধ হয়েছি। সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা এবং অনুষ্ঠানের প্রসঙ্গে সুমিতাদি, মহামায়া এবং অরুনিমার সাহচর্য সবসময়ই special ছিল। যেমন ছিল, আছে ড. তনুশ্রী মণ্ডলের (বর্তমান টি. সি. এস.) সঙ্গে। পরম প্রাপ্তি সেই সময়ের কিছু সিনিয়ার অধ্যাপক-অধ্যাপিকা, আমাদের স্যার / ম্যাম / দাদা / দিদি। পীযুষবাবু (যাঁর কাছে উচ্চমাধ্যমিকে অঙ্ক কষার অন্য স্বাদ পেয়েছি, আর যিনি স্টাফরুম মাতিয়ে দিতেন মহাভারতের গল্প বলে), মুরারী মান্না (জীবনের আনন্দে যিনি 'জীবনানন্দ' দেখেছিলেন), কার্ত্তিকবাবু, শক্তি (মান্না) স্যার, আমাদের সকলের অভিভাবক। যিনি স্নেহ-ভালবাসা দিয়ে আগলে রাখতেন সকলকে। আর পরীক্ষা হলে টুকলি ধরার বাঘ। আমরা invigilator রা পর্যন্ত ভয়ে চমকে যেতাম, অন্যদিকে Picnic-এর well organiser। সবাইকে না খাইয়ে কখনই খেতেন না। এমনি এমনি কি উনি চলে যাবার পর কেউ চোখের জল ধরে রাখতে পারেননি?

ছিলেন সংস্কৃতের মৃত্যুঞ্জয়বাবু। যাঁর 'শকুন্তলা' পড়ানো আজো কিংবদন্তী হয়ে আছে। আজ আমাকে যখন (ইংরাজীতে) পড়াতে হয়, মনে হয় 'কাকে দিয়েছো রাজার পার্ট'। লজ্জায় মাথা হেঁট হয়ে যায়। আর গুরুদেবতুল্য মানুষটি সোফায় বসে যখন ফলমূলসহ টিফিন করতেন, পাশের মানুষটিকে না খাইয়ে কখনও

খেতেন না। এ হেন মানুষ আজ বিরল। ছিলেন শক্তি ভট্টাচার্য (শব্দছক করার মাস্টার মানুষ এবং income tax calculation-এর জন্য অনেকেরই মুশকিল আসান। যেমন সুনীল শতপথীবাবু, যিনি আবার কত ব্যক্তিগত সুপরামর্শ দিতেন স্নেহে, ভালবাসায়)। শব্দছকের সঙ্গে কবিতা লেখার ভালবাসাময় পাঠ পেয়েছি দুর্গা মণ্ডলের কাছে। শশধর (কোলে) বাবু তো নিজের বাবার মতো স্নেহ করতেন, সুপরমার্শ দিতেন। ঠিক যেমনটি ছিলেন Botany-র অমলেন্দু সামুই (বাবু), Physics-এর সৃষ্টিধরবাবু, আনন্দবাবু, Zoology-র পরিমলবাবু, মনমোহন বাবু ("ডাক্তারবাবুর প্রেসক্রিপশান মতো ওষুধটি ঠিক খেয়ে যেও, আর কোনো চিন্তা নেই" - এই পরামর্শ আজো মনে আছে)। মজার মানুষ ছিলেন তরুণ (ঘটক) বাবু এবং Philosophy-র বিমলেন্দু সামন্ত। প্রথম জন ভালো চুটকি আওড়াতেন এবং গান করতেন ("ভালো আছি ভালো থেকো আকাশের ঠিকানায় চিঠি লিখো" - আজও কানে ভাসে)। দ্বিতীয় জনের Farewell-এ বলা কথাটা কোনোদিনও ভুলব না - "যা হয়েছে তা ভালোই হয়েছে, যা হচ্ছে তা ভালোই হচ্ছে, যা হবে তা ভালোই হবে"।

অন্যদিকে স্মিতহাস্য, স্বল্পবাক, জ্ঞানী, রসিক মানুষ Chemistry-র পূর্ণানন্দবাবু। রাজীব দা (রাজীব চক্রবর্তী, অনন্তদার সঙ্গে আমার বিভাগের প্রথম সহকর্মী)-র সঙ্গে কলেজ ফেরার পথে শ্রীবিষ্ণু মিষ্টান্ন ভাণ্ডারে আমাদেরকে প্রায় একসাথে খেতে দেখে বলেছিলেন, "তোমাদের কী একই Fund?" আমি মনে মনে বলেছিলাম, "হ্যাঁ, তবে টাকার নয়, বন্ধুত্বের, ভালবাসার"।

প্রাণী বিভাগের স্বপনবাবুর ভালবাসা বিরল। আমার পেটের সমস্যার সঠিক ঠিকানা (AIG, Hydrabad) তিনিই প্রথম দিয়েছিলেন। আর সামনাসামনি হলেই মুচকি হাসি দিয়ে বলতেন, "উদয়ের পথে শুনি কার বাণী" ...

রীতাদি সত্যিই দার্শনিক। প্রগাঢ় পাণ্ডিত্যের অধিকারী, সুকণ্ঠী, স্মিতহাস্য, স্নেহময়ী। একবার ওনার হাজার তিনেক টাকা বাসে হারিয়ে গিয়েছিল। সবাই যেন ময়না তদন্তে। উনি টুক করে বললেন, "আসলে টাকাটা বোধহয় আমার থেকে আজ যিনি পেয়েছেন তার বেশী প্রয়োজন ছিল।" জানি না Nobel চুরি ব্যাপারটা ওনার সময়ে হলে কী বলতেন!

স্মিতহাস্য স্নেহময়ী যশো (ধরা) দি। আর অনিতাদি। যত কম বলা যায়, ততই ভালো। গল্পে, নাচে, গানে, আড্ডায়, চুটকিতে সবসময় জমিয়ে রাখতেন (পিকনিকের) আসর। খুব মিস করি এনাদের সকলকে।

পেয়েছিলাম মইন (উদ্দিন) দাকে। সুঠাম, সুপুরুষ, প্রতিবাদী, বাগ্মী, ভাল ইংরাজী বলতেন ও লিখতেন। আর পিকনিকে ওনার কণ্ঠে "চুরা লিয়া হ্যায় তুমনে জো দিল কো" তো ওনার সিগনেচার। তারসঙ্গে তারক (নাথ) দা কে, যিনি বর্তমানে চাতরা রামাই পণ্ডিত মহাবিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ। পান-জর্দা মুখে মানুষটি বেশ রসিকও বটে। নিয়ম করে সাহিত্য পড়েন, গল্প share করেন। আর শচীন কর্তার কণ্ঠে "বর্ণে, গন্ধে, ছন্দে,

গীতিতে দিয়েছো দোলা" - আজও তেমনিভাবে দোলা দেয়। তখন কে বলবে উনি Economics-এর লোক?

আর হরদা (হরেকৃষ্ণ সামন্ত)। যেমন তাগড়াই চেহারা, তেমন খেতে পারতেন। আজও বর্তমান প্রিন্সিপ্যাল স্যার সস্নেহে ওনার খাওয়ার কথা বলেন। একবার একসাথে Rajabazar Science College এ Orientation Programme করেছিলাম। David Hare ট্রেনিং কলেজে দু'জনে থাকতাম। সারাদিন journey, ক্লাস এ সবের পর যখন শুতে যেতাম, তখন উনি দাদা থেকে একেবারে বন্ধু হয়ে উঠতেন। সে সব আদি রসাত্মক গল্প এখানে share না করাই ভালো।

সংস্কৃতের দেবুদার স্নেহ ভালোবাসা ভুলব না কোনোদিন। আর ওনার জীবন সংগ্রাম (একবার তারাবাগে Spot Evaluation করতে গিয়ে রুমমেট হিসাবে শুনেছিলাম) আমার চির অনুপ্রেরণা।

এরপর প্রণব (দালাল) দা, পরমার্থ (ঘোষ) দা, যিনি বর্তমানে বেঙ্গাই অঘোরকামিনী প্রকাশচন্দ্র মহাবিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ, গোপালদা (সিনহা) এবং সুমন্ত্রদা।

প্রথম জনের কাছ থেকে পাওয়া শারীরিক দুর্বলতাকে ইচ্ছাশক্তি দিয়ে জয় করে কী করে উপরে ওঠা যায় তার মানসিকতা। স্বল্পহারী, বাকসংযমী, নীচুকণ্ঠ মানুষটির কাছে স্নেহে এবং শাসনে অনেক কিছু শিখেছি। বিশেষ করে বেশকিছু ইংরাজী। Cinema hall is opposite the book stall কিন্তু opposite to নয়, যিনি Sponsor করে তিনিও Sponsorer নন - এই ভুলগুলো সংশোধন করে দিয়েছেন তিনি। ওনার কাছেই শিখেছি incumbent শব্দটি এবং যদি অর্থে 'provided' কথাটি। শিখেছি এক বিখ্যাত পণ্ডিতের বিখ্যাত কথা - "I obey law not because the law is right but because it is my right to obey law" এ হেন মানুষটি মান্নাপ্রেমী। ওনার গান গাইতেনও খুব passionately।

পরমার্থদা স্মিতভাষী, শান্ত, ধীর সহজে প্ররোচিত হতেন না। ঠাণ্ডা মাথায় পরিস্থিতি মোকাবিলার মাষ্টার। তাই বোধহয় জীবনের পরবর্তী অধ্যায়ে অধ্যক্ষ হিসাবে সফল। ২০০৭ সালে ওনার আন্ডারে NAAC করার সময় পাশে থেকে অনেক কাজ শিখেছি, যা ২০১৫ সালে আমার Co-ordinatorship-এ NAAC করার সময় কী কাজে এসেছে তা ভাষায় বোঝানো যাবে না। ভুগোলের শিক্ষক তো কী? ইনিও মান্না স্পেশালিষ্ট। যে কোনো Programme-এ ওনার গলায় 'কফি হাউস' একেবারে ওনার signature।

গোপালদা তো আমার গ্রামের মানুষ, কাছের মানুষ। ঘটনাক্রমে গ্রামে ওনার বাবা আর আমার বাবা অভিন্নহৃদয় বন্ধু। এখান স্নেহভাজন দাদা, অভিভাবকের মতো আশ্রয়-প্রশ্রয় দিয়ে আগলে রেখেছেন। আর শূন্য থেকে শুরু করে ওনার আজকের উত্থান ...... সেটাই তো একটা 'ইতিহাস', আমাদের সকলের অনুপ্রেরণা। ছোটবেলা থেকে চিনি। রুগ্ন স্বাস্থ্য থেকে আজ সুঠাম-সুন্দর স্বাস্থ্যের অধিকারী। সৌজন্যে দীর্ঘ প্রায় চার দশকের disciplined জীবন ও শরীর চর্চা। 'আয়রন ম্যান' নীলমণি দাশের চেলা বলে কথা।

সুমন্ত্রদা। অগাধ পাণ্ডিত্য। কিন্তু অমায়িক সদাহাস্যময়। সময়ে-অসময়ে কত কী জানতে চেয়ে জ্বালাতন করেছি। কখনও বিরক্ত হননি। হয় then and there বলে দিয়েছেন, নয় পরে সময় দিয়ে খুঁজে দিয়েছেন। আজকালকার যুগে কে কাকে এত সময় দেয়? ভালোবেসে কাছে টেনে নেওয়ার মানুষ। মনে থাকবে চিরকাল।

Economics Department-এর (ড.) স্বপন (লাহা) দা - প্রথম জনের স্কুল মাস্টারির পরও কিছু করার অদম্য তাগিদ আমার অনুপ্রেরণা - কী পি. এইচ. ডি করা, কী কলেজে পড়ানো, কী স্নাতক স্তরের (সাম্মানিক এবং সাধারণ শাখার) বই লেখা এবং তার সঙ্গে সাহিত্য চর্চা। সহজ, সরল,। মিশুক মানুষটি ক্রমাগত কবিতা, প্রবন্ধ, গল্পের বই লিখে চলেছেন এবং শেয়ার করেন। আমাকে যে ভালবাসা উনি দিয়ে চলেছেন বছরের পর বছর ধরে তা ভাষায় প্রকাশ করা যাবে না।

এবার 'স্যার'। আমার দ্বিতীয় অধ্যক্ষ মহাশয়। কলেজের সকল কাজের কর্ণধার। যাঁকে নিয়ে একটা আলাদা প্রবন্ধ লেখা যায়। তবে কয়েকটা বিশেষ দিক তো উল্লেখ করতেই হয়। পরিকাঠামোগত অভূতপূর্ব উন্নয়নের কথা অনেকেই বলবেন। আমি বরং অন্য কয়েকটা দিকের কথা বলি -

১। কাজ করার উপযুক্ত পরিবেশ দান।

২। বিজয়বাবুর আমলের ৫ ঘন্টা / ৫দিন কর্মসংস্কৃতিকে বজায় রাখা।

৩। ইট, কাঠ, পাথর নয় - পড়াশোনার মানোয়ন্নের দিকে নজর। ফলশ্রুতিতে ইউনিভার্সিটি পরীক্ষার প্রত্যাশিত ফলাফল।

৪। নিজের রাজনৈতিক মতাদর্শের উর্ধ্বে উঠে প্রকৃত জ্ঞানীগুণিদের নিয়ে এসে সেমিনার কনফারেন্স করানো। আনুড় বি. এড কলেজের স্বনামধন্য অধ্যক্ষ ড. বিনয়কৃষ্ণ মুখার্জী (যিনি রাজনৈতিকভাবে ওনার অন্য মেরুর লোক ছিলেন), তাঁকে নিয়ে এসে বক্তৃতা দেওয়ানোর ব্যাপারে কুণ্ঠাবোধ করেননি।

৫। আমাকে এবং অমিত (ড. তিওয়ারি) কে নানা ধরণের চিঠি-চাপাটি, ড্রাফটিং এর দায়িত্বদানে বাধিত করা।

৬। ২০১৫-এ আমি যখন NAAC-এর Co-ordinator, তখন এই কর্মযজ্ঞে সংশ্লিষ্ট সকলকে সর্বতোভাবে উৎসাহিত করা, সহযোগিতা করা, চা-জলখাবার-লাঞ্চ খাওয়ানো, নিজের গাড়িতে করে দিন থেকে রাত ১০টা/১১টা/১২টা পর্যন্ত কলেজে নিয়ে যাওয়া এবং ফিরতি পথে বাড়িতে পৌঁছে দেওয়া। কখনও ভোলার নয় এসব।

৭। Teacher দের Journal 'FOCUS' - প্রকাশনা (যেটা ছিল ওনারই brain child)। পরে যেটা UGC-approved হয়।

৮। গ্রন্থাগারিক বাসুদেববাবুকে সঙ্গে নিয়ে Career Counselling চালানো এবং off campus এবং on

campus programme এর ব্যবস্থা করে ছাত্র-ছাত্রীদের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা।

৯। আমার Co-ordinatorship এ UGC Approved Entry in Service এবং তিলকের Co-ordinatorship-এ Remidial Coaching চালানো।

১০। রামকৃষ্ণ মিশনের মহারাজ (শ্রীমৎস্বামী ভক্তি প্রিয়ানন্দজী) দের নিয়ে এসে Value Education এর উপর আলোচনা সভা করানো এবং এর মাধ্যমে ছাত্র-ছাত্রীদের holistic development এর ব্যবস্থা (ইত্যাদি, ইত্যাদি ...)।

এত সবের পরেও এই ৬০-৬৫ বছর বয়সেও যে কী করে দেহ-মনে সুস্থ-সবল তরুণের মতো হয়ে আছেন। এটাই রহস্য। আমরা তো ৫৫-৫৬ তেই বুড়িয়ে গেলাম।

২০১৫-এর NAAC-এর কাজে মাননীয় অধ্যক্ষ ছাড়াও সবসময়ে পাশে ছিলেন ডঃ বিশ্বনাথ গরাই (বর্তমান উপাধ্যক্ষ) এবং ডঃ তিলকনাথ ঘোষ (তৎকালীন পরিচালন সমিতির দুই শিক্ষক প্রতিনিধি)। কলেজ পরিচালনার কাজ ছাড়াও বিশ্বনাথ একসময় burser-এর দায়িত্ব সামলেছেন, বিভাগ পরিচালনার মতোই সুদক্ষ ভাবে, সামলেছেন IGNOU-র Co-Ordinator এর দায়িত্ব। শারীরিক প্রতিবন্ধকতাকে উপেক্ষা করে রাতের পর রাত জেগে কলেজ এবং University পরীক্ষার duty chart বানিয়েছেন নীরবে, নিভৃতে, ঠিক আগেকার শক্তি মান্না স্যারের যোগ্য উত্তরসূরী হিসাবে। এখন অবশ্য ব্যাটনটা বিশ্বনাথ দিয়েছেন তাঁর যোগ্য একজন উত্তরসুরীকে, সে আর কেউ নয়, রাষ্ট্রবিজ্ঞানের সুজিত পাঁজা। তিলকবাবু এখন পড়ানো ডিপার্টমেন্ট চালানো ছাড়াও দক্ষতার সঙ্গে NSOU (Netaji Subhas Open University)-এর দায়িত্ব সামলাচ্ছেন। ওর কাছে যেটা শেখার সেটা হলো 'চাপ নিও না', হাসিমুখে হালকাভাবে সবকিছুকে নাও, দেখবে সব সমস্যা সামোসা হয়ে গেছে।

এঁরা ছাড়াও ছিলেন ড. অমিত এস তিওয়ারী (বর্তমান IQAC এর Co-ordinator), ড. আশিষ পাল (তৎকালীন NSS-এর অন্যতম কনভেনর), ড. নন্দিতা ভুক্ত (Cultural Sub-Committee-র convenor)। ছিলেন এবং আছেন ড. তীর্থঙ্কর মল্লিক, ড. সুমন্ত রায়, কম্পিউটারের বিপাশা এবং অধ্যাপক প্রদীপ পাল। বাংলা বিভাগে সাফল্যের সঙ্গে পড়ানো ছাড়াও একসময় সামলেছেন NSS-এর দায়িত্ব, কলেজের বাগান তৈরি এবং পরিচর্চার কাজ নিজ হাতে করেছেন এবং Picnic সহ অন্যান্য occasion-এ রাঁধুনী হিসাবে, যোগানদার হিসাবে কাজ করেছেন, পরিবেশন করে সকলকে খাইয়ে তারপরে নিজে খেয়েছেন। এছাড়াও Examination Sub-Committee তে আজও সকাল থেকে সন্ধে পর্যন্ত নিরলস কাজ করে চলেছেন বেশি কথা না বলে।

আরও যাঁদের কথা বলতেই হবে, তাঁরা হলেন বাসুদেববাবু ও সঞ্জয়বাবু - এই দুই লাইব্রেরিয়ান, অধ্যাপক

হেমন্ত সাঁতরা, অধ্যাপিকা সোনালী মজুমদার, মহুয়া সাহা, রণজিৎ দাস (শারীরশিক্ষা বিভাগ), কুঞ্জদাস মুর্মু (সাঁওতালি বিভাগ), শ্রীকান্ত পাত্র, সুশান্ত কুণ্ডু, বিবেকদা, সুব্রতবাবু, অলোকদা, নাজির খাঁ, লামা ভাই, শৈলেন বাগ এবং লাইব্রেরির কৃষ্ণ, যাঁর Art Work-এর (কলেজ museum-এ রক্ষিত) উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেছিলেন NAAC Peer team এর সদস্যরা। ছিলেন Yoga বিভাগের সন্ন্যাসী প্রামাণিক এবং মানসী মিদ্যা সহ অন্যান্যরা। প্রসঙ্গত এই Yoga কে NAAC Peer team-এর কলেজের দুটো Best Practice-এর মধ্যে একটি নির্বাচিত করেছিলেন। আর একটি হল Principal স্যার পরিকল্পিত University-র পরীক্ষায় First Class পাওয়া ছাত্র-ছাত্রীদের বিনা বেতনে কলেজে পড়ার ব্যবস্থা।

তবে NAAC এর কাজে বিশেষভাবে যার নাম করতে হয়, সে হল আমার ভ্রাতৃপ্রতিম রামানুজ (মুখার্জী)। আমার সর্বক্ষণের সঙ্গী। নিজের Laptop ব্যবহার করে technical support দেওয়া তো আছেই, তার সঙ্গে সময়ে-অসময়ে নতুন নতুন concept দিয়ে এবং সেটাকে ঠিকঠাক প্রকাশের suggestion দিয়ে বাধিত করেছেন ঘন্টার পর ঘন্টা। Preparation পর্বে, এবং NAAC visit এর দিনগুলিতে IQAC Co-ordinator এবং Principal Sir এর PPT প্রস্তুত করে দিয়েছেন এবং Present করেছেন Peer team-এর সামনে। সর্বোপরি এই রামানুজের জন্যেই UGC-র Act. 1956 অনুসারে কলেজের অত্যন্ত প্রয়োজনীয় 2(f) এবং 12 (b) certificate এনেছেন UGC-র Chairman-এর সাথে কথা বলে। এটা কলেজে না থাকা মানে UGC -র affiliationজনিত identity crisis । অথচ আগে আমাদের ছিল না। রামানুজের এতবড়ো কাজের কথা সবাই ভুলে গেলেও আমি কখনও ভুলবো না।

এবার আসি নিজের Department-এ। প্রয়াত অনন্তদা ছাড়াও প্রথম পথ চলার সাথী হিসাবে পেয়েছিলাম রাজীব (চক্রবর্তী) কে। দিনের পর দিন পেরোয়, ও হয়ে ওঠে আমার কাছের বন্ধু এবং তার থেকে পারিবারিক সম্পর্ক। শুধু পড়ানো নয়, পড়াশোনার বাইরে শিল্প-সংস্কৃতি, রাজনীতি, খেলাধুলা, সিনেমা, বিভাগ পরিচালনা - সব ব্যাপারে অগাধ জ্ঞান। সারাজীবন ওর কাছে শিখে চলেছি। শিখতে ভুলে গেলে বড়ো গরীব হয়ে যাবো। এরপর ড. নন্দিতা (ভুক্ত), দেবাশীষ (ঘোষ), ফাল্গুনী, সুদীপ দত্ত, মুক্তি, জয়ন্ত, শতদল, সৌমিত্র, রাজশ্রী, ছন্দা, পূর্বা, দিব্যেন্দু (রাজা), সুমন্ত (ভট্টাচার্য), ব্রততী, দেবশ্রী, শম্ভু, সংহিতা, তৃষিতা, দয়াল, চৈতালী - এদের সক্রিয় সহযোগিতায় ঠিকঠাক চলছে বিভাগ এবং তার কাজকর্ম। এদের প্রত্যেকের কাছে লেখাপড়া এবং লেখাপড়ার বাইরে অনেক কিছু শিখেছি, সমৃদ্ধ হয়ে চলেছি, হতেও চাই আজীবন। ডিপার্টমেন্টের যা কিছু ভালো, যা কিছু সাফল্য সবই সকলের সম্মিলিত মেধা এবং প্রচেষ্টার ফসল। যা কিছু ভুল-ত্রুটি হয়তো সবই আমার।

এবার কলেজের আসল প্রাণ, আমার স্নেহের ছাত্র-ছাত্রীরা। আমাদের অনেকের গুরুদেবতুল্য স্যার

বর্ধমানের দিলীপ (মুখার্জী) প্রায়ই বলতেন, ''আজ যাদের student বলা হয়, তাদের একসময় বলা হতো Pupil। Pupil অর্থে চোখের মণি। ছাত্র-ছাত্রীরা যদি শিক্ষক / শিক্ষিকাদের চোখের মণি না হয়, তো কারা?'' তাই তোমরা যারা এসেছিলে, আসছো, আসবে, প্রত্যেককে ধন্যবাদ, কৃতজ্ঞতা জানানোর ভাষা আমার জানা নেই। দিনের পর দিন, ঘন্টার পর ঘন্টা আমাকে সহ্য করেছো, আর কিছু ভাব বিনিময়ের সুযোগ করে দিয়েছো। কত কী শিখেছি তোমাদের কাছে। যেদিন এই Student সত্ত্বা মরে যাবে, সেদিন তো আমার শিক্ষক সত্ত্বারও মৃত্যু। তোমরাই আমার নবরূপী নারায়ণ। ঈশ্বরকে যে কী বলে ধন্যবাদ জানাই, সারাজীবন তোমাদের সেবা করার সুযোগ করে দিয়েছেন। তোমাদেরকে ভালবাসা মিশ্রিত প্রণতি জানাতে আমার কোনো সঙ্কোচ নেই।

সবশেষে আমার মা তুল্য প্রতিষ্ঠান। যাঁর নামাঙ্কিত কলেজ, ভারতমাতার সেই সোনার ছেলেকে শতকোটি প্রণাম। প্রণাম কলেজের প্রতিষ্ঠাতা ডাঃ রাধাকৃষ্ণ পাল সহ সবাইকে। কলেজের প্লাটিনাম জয়ন্তীর মাইল ফলকের সাক্ষী রইলাম। ধন্য আমা (দের) জীবন। হে আমার পথের আলো, তুমিই তো আমার রুটি-রোজগারের উৎস, তুমিই আমার প্রাণ-পরিচিতি। আজ এই মাহেন্দ্রক্ষণে দাঁড়িয়ে কলেজের প্রাক্তন এবং বর্তমান সমস্ত অন্তরজন (উল্লেখিত নামগুলো বাদেও যাঁরা রয়ে গেলেন / গেলো, সেই শ্রদ্ধেয় / প্রিয় শিক্ষক-শিক্ষিকা, শিক্ষাকর্মী বন্ধু এবং প্রাণাধিক প্রাণ ছাত্র-ছাত্রীরা) কে আমার আন্তরিক প্রণাম, শ্রদ্ধা, প্রীতি, শুভেচ্ছা ও ভালবাসা জানাই। ঠাকুর, মা, স্বামীজির কাছে প্রার্থনা, যাঁরা চলে গেছেন তাঁদের আত্মার শান্তি হোক, যাঁরা রয়ে গেছেন তাঁরা সবাই দেহ-মনে ভালো থাক, সবার মঙ্গল হোক। আমরা তো সব একদিন চলে যাবো। থেকে যাবে নেতাজী মহাবিদ্যালয় এবং উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি হতে হতে রাজ্য থেকে দেশে-বিদেশে পরিচিতি পাবে। আর আমার তরফ থেকে বলতে পারি - ''তোমারে যা দিয়েছিনু, সে তোমারি দান / গ্রহণ করেছো যতো, ঋণীও তো করেছ আমায়''।

শেষ থেকে শুরু করেছিলাম। তবে শুরু থেকে শেষ নয় কেন? সেটা ১৯৯৬ সালের ১১ই অক্টোবর। মায়ের পুজোর ঠিক আগে মাথা ঠেকিয়েছিলাম তোমার পায়ে। এই মাহেন্দ্রক্ষণেও বলি -

''চরণ ধরিতে দিও গো আমারে, নিও না, নিও না সরায়ে''।

নেতাজী মহাবিদ্যালয় ঃ এক বাই ফোকাল লেন্সে

ড. তিলকনাথ ঘোষ

১৯৮৭ সাল। সবেমাত্র হায়ার সেকেন্ডারির গণ্ডি পার হয়েছি এবং স্বপ্ন দেখছি ভালো একটা কলেজে ভর্তি হয়ে উচ্চশিক্ষায় ব্রতী হব। তখন আরামবাগ মহকুমায় কমার্স নিয়ে পড়ার জন্য আরামবাগ নেতাজী মহাবিদ্যালয় শ্রেষ্ঠ স্থানে আছে। আমি একাউন্টেন্সি অনার্স নিয়ে পড়ার জন্য মফঃস্বলের কলেজ সহ কলকাতার অনেক কলেজে ভর্তির আবেদন করলেও এবং সুযোগ পেলেও বাবার কথামতো নেতাজী মহাবিদ্যালয়ে ভর্তি হলাম। প্রথমদিন কলেজে এসে দেখি কলেজটি একেবারে গ্রামের মধ্যে অবস্থিত (যদিও আরামবাগ পৌরসভার অধীন) এবং চতুর্দিক বনজঙ্গলে ভর্তি। পঠন-পাঠনের দিক থেকে কলেজটির বিশেষ করে 'বাণিজ্য' বিভাগের নাম বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তর্গত বিভিন্ন কলেজের মধ্যে একটা অন্যতম স্থান দখল করে আছে বলে এখানেই থেকে গেলাম গ্র্যাজুয়েশন করার জন্য। তৎকালীন সময়ে কলেজের মধ্যে বিভিন্ন রকম রাজনৈতিক ডামাডোল ছিল, কারণ কলেজের ভেতরে ছাত্র সংসদ ছিল কংগ্রেসী রাজনৈতিক নেতৃত্বের হাতে এবং কলেজের বাইরে সর্বত্র বামপন্থী রাজনীতি ও রাজনৈতিক কর্তৃত্ব বিরাজমান থাকত তাদের হাতে। তবুও তৎকালীন দক্ষ অধ্যক্ষের নেতৃত্বে পঠন-পাঠনের দিকটি ছিল খুবই ভালো। তিনি পঠন-পাঠনের উপর রাজনৈতিক প্রতিকূলতার প্রভাব কখনই পড়তে দেননি।

১৯৮৭ সালে আমি যখন কলেজে এলাম, তখন কলেজের পরিকাঠামো বলতে গেটে ঢুকে বাঁদিকে দোতলা ইউজিসি বিল্ডিং, ডানদিকে শিক্ষক মহাশয়দের বসার ঘর এবং লাইব্রেরী। পশ্চিমদিকে টিনের চাল দেওয়া রসায়ন বিভাগ ও পদার্থ বিজ্ঞান বিভাগের ল্যাবরেটরি এবং দক্ষিণদিকে একটি ভাঙাচোরা দোতলা বাড়ি, যার নীচে কলেজের অফিস এবং প্রিন্সিপালের বসার ঘর। পাশেই খেলার মাঠ এবং মাঠের পশ্চিমদিকে বহু ফাটল বিশিষ্ট চার কামরার একটি ছাত্রাবাস এবং খড়ের ও টালির ছাউনি দেওয়া ইটের দেওয়াল দেওয়া পাঁচটি ছোট ছোট ঘর, দেখতে প্রায় মুরগি পোল্ট্রির মতো, যার মধ্যে একটিতে হোস্টেল সুপারিনটেনডেন্ট থাকতেন, একটিতে সৌভাগ্যবশত আমি ও আমার দুই বন্ধু থাকার সুযোগ পেয়েছিলাম। কারণ পর্যাপ্ত হোস্টেল ছিল না, বাকি তিনটি ঘরে বিভিন্ন বিষয়ের ক্লাস হতো। অর্থাৎ সেগুলো শ্রেণীকক্ষ হিসাবে ব্যবহার হতো।

১৯৮৭-৯০ শিক্ষাবর্ষে বাণিজ্য বিভাগের ছাত্র ছিলাম। তখন বাণিজ্য বিভাগের বিভাগীয় প্রধান ছিলেন অধ্যাপক আদিত্য রঞ্জন চট্টোপাধ্যায় এবং অন্যান্য শ্রদ্ধেয় মাস্টারমশাইরা হলেন অধ্যাপক ভবানীপ্রসাদ চট্টরাজ, অধ্যাপক দেবপ্রসাদ সামন্ত, অধ্যাপক শশধর কোলে, অধ্যাপক মনিমোহন নন্দী এবং আমাদের বিষয়টি

* প্রাক্তন ছাত্র ও অধ্যাপক, বাণিজ্য বিভাগ

'মাল্টি-ডিসিপ্লিনারি' (multi-disciplinary) হওয়ার সুবাদে এই বিভাগের সাথে যুক্ত অন্যান্য অধ্যাপকরা হলেন অধ্যাপক পীযূষকান্তি পাল, অধ্যাপক তিনকড়ি নায়েক, অধ্যাপক রমাপ্রসাদ ঘোষ, অধ্যাপক রবীন আদক, অধ্যাপক নবকুমার ঘোষ ও স্বপন কুমার লাহা মহাশয়। তখন বাণিজ্য বিভাগের ক্লাস শুরু হতো দুপুর দুটোর পর এবং সন্ধ্যা ৬.৪০ পর্যন্ত ক্লাস চলতো। আমরা যখন কলেজ ক্যাম্পাসে ঢুকতাম তখন কলা ও বিজ্ঞান বিভাগের ছাত্র-ছাত্রীরা বাড়ি ফিরতো। ফলে গোটা কলেজ বাণিজ্য বিভাগের দখলেই থাকতো এবং আমরা রীতিমতো দাপিয়ে বেড়াতাম। আমাদের সাথে আমাদের মাষ্টারমশাইদের একটা বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক বজায় থাকতো এবং আমরা স্বাভাবিকভাবেই সমস্ত ক্লাসে উপস্থিত থাকতাম।

১৯৯৬ সাল। আমি এই কলেজের বাণিজ্য বিভাগের একজন অধ্যাপক হিসাবে যোগদান করি। এই বিভাগটি পথচলা শুরু করেছিল ১৯৬৯ সালে এবং সেই বছরেই আমি পৃথিবীতে আসি। এটা আমার কাছে খুব সৌভাগ্য যে, আমি যে মহাবিদ্যালয় থেকে পাশ করেছি, সেই মহাবিদ্যালয়ের একজন অধ্যাপক হিসাবে এবং আমার শ্রদ্ধেয় মাষ্টারমশাইদের সান্নিধ্যে থেকে নিজেকে তৈরি করার সুযোগ পেয়েছি। আমি যখন বাণিজ্য বিভাগের অধ্যাপক হিসাবে যোগদান করি, তখন এই বিভাগের পাঁচজন অধ্যাপকের মধ্যে চারজন আমার শ্রদ্ধেয় মাষ্টারমশাই। প্রথম থেকেই ওনারা আমাকে বিভাগীয় বিভিন্ন কাজের দায়িত্ব দিতেন। এটাও আমার কাছে খুবই গর্বের যে, আমি ওনাদের আস্থা অর্জন করতে পেরেছিলাম। বাণিজ্য বিভাগের বহু কৃতি ছাত্র বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে, এমনকি বিশ্ববিদ্যালয় এবং বিভিন্ন প্রশাসনিক দপ্তরে কর্মরত ছিলেন, আছেন এবং আশাকরি ভবিষ্যতেও থাকবেন। আমি একটা বিষয় অনুভব করেছি যে, এই বিভাগের সুদৃঢ় ছাত্র-শিক্ষক সম্পর্ক, উৎসাহ ও উদ্দীপনা বাণিজ্য বিষয় নিয়ে পড়াশোনা করার জন্য এই বিভাগকে একটা আদর্শ স্থানে উপনীত করেছে এবং নেতাজী মহাবিদ্যালয়কে বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের এবং আরামবাগ মহকুমার অন্যান্য কলেজের মধ্যে একটা বিশেষ স্থানে পৌঁছে দিয়েছে। আমার শ্রদ্ধেয় স্যারদের শিক্ষায় ও আমার সহকর্মী অধ্যাপকদের সহযোগিতায় বর্তমানে বাণিজ্য বিভাগের বিভাগীয় প্রধানের দায়িত্বে কর্মরত। জানিনা এই বিভাগকে আগের মত মর্যাদা সহ পরিচালিত করতে পারছি কিনা। তা মুল্যায়িত হবে কলেজের কর্তৃপক্ষ ও অতীত, বর্তমান এবং ভবিষ্যৎ ছাত্র-ছাত্রীদের দ্বারা।

বাণিজ্য বিভাগ ছাড়িয়ে এবার আসি নেতাজী মহাবিদ্যালয়ের সার্বিক বিষয়ে। একটা কথা আমরা সকলেই জানি ও মানি যে, পরিবারের কর্তা দক্ষ ও দূরদৃষ্টি সম্পন্ন হলে সেই পরিবারের উন্নতি ঘটবেই। ঠিক তাই ঘটেছে এই মহাবিদ্যালয়ের ক্ষেত্রে। এই মহাবিদ্যালয় পেয়েছিল অধ্যক্ষ হিসাবে শ্রী বিজয়কৃষ্ণ ঘোষ মহাশয়কে, যিনি ছিলেন একজন দক্ষ, অভিজ্ঞ, পরিশ্রমী, কঠোর শৃঙ্খলাপরায়ণ ও দূরদৃষ্টি সম্পন্ন ব্যক্তি। ওনার মূল কেন্দ্রবিন্দু ছিল পঠন-পাঠন। বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীন বিভিন্ন পাঠক্রম এই কলেজে চালু

করার মাধ্যমে কলেজের ক্রম উন্নতি ঘটতে দেখেছি। তখন তহবিল সংক্রান্ত সমস্যা থাকলেও পরিকাঠামোগত উন্নতির পথে কোন বিঘ্ন ঘটেনি এবং সেটা ওনার বুদ্ধিমত্তা, প্রায়োগিক কৌশল এবং নিরলস প্রচেষ্টার গুণে। তৎকালীন অধ্যক্ষ মহাশয় এই মহাবিদ্যালয়ের ক্রমবিকাশের প্রদীপ প্রজ্জ্বলিত করে একটি নির্দিষ্ট মানে উন্নীত করার পর তাঁর দূরদর্শিতা ও বিচক্ষণতাকে কাজে লাগিয়ে ২০০৩ সালের মার্চ মাসে যোগ্য উত্তরসূরি হিসাবে ড. অসীম কুমার দে-র হাতে কলেজের দায়িত্বভার তুলে দেন।

নেতাজী মহাবিদ্যালয় আবারো পেয়ে গেল এক দক্ষ, উদ্যমী ও দূরদর্শিতাসম্পন্ন এক অধ্যক্ষকে, যাঁর নেতৃত্বে ও অন্তর্জনদের সহযোগিতায় এই কলেজের পরিকাঠামোগত ও পঠন-পাঠনগত উন্নতি ত্বরান্বিত হল। নেতাজী মহাবিদ্যালয় পেয়ে গেল উন্নতমানের অডিটোরিয়াম সহ প্রশাসনিক ভবন, বি. এম. বিল্ডিং। উন্নত নলেজ হাউস, ইনডোর গেমস অডিটোরিয়াম, নাট্যগৃহ, একাধিক ছাত্রাবাস ও ছাত্রীনিবাস, স্মার্ট ক্লাসরুম এবং পেতে চলেছে প্লাটিনাম জুবিলি বিল্ডিং, আরো অনেক কিছু। এককথায় পরিকাঠামোগত দিক থেকে এই মহাবিদ্যালয় এক মহীরূহ রূপ ধারণ করেছে এবং উন্নতির চরম পর্যায়ে পৌঁছেছে, যা চোখে পড়ার মতো। শুধু পরিকাঠামোগত উন্নতিই নয়, বিভিন্ন বিষয়ে অনার্স কোর্স ও মাস্টার ডিগ্রি কোর্স চালু করার মাধ্যমে আমাদের কলেজ এখন আরামবাগ মহকুমা তথা হুগলি জেলাতে এক বিশেষ স্থানের অধিকারী। এই কলেজে ইন্দিরা গান্ধী জাতীয় মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় এবং নেতাজী সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় পাঠকেন্দ্র অবস্থিত, যা আরামবাগ মহকুমার মধ্যে অন্যতম। আর একটা কথা উল্লেখ না করলে লেখাটা অসম্পূর্ণ থেকে যায়, সেটা হল আমাদের কলেজের অন্তর্জনের অর্থাৎ অধ্যাপক-অধ্যাপিকা, শিক্ষাকর্মী, ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে সুমধুর সম্পর্ক এবং কলেজের প্রতিটি উন্নয়নমূলক কাজে সক্রিয় অংশগ্রহণ।

আমার সৌভাগ্য যে, আমি নেতাজী মহাবিদ্যালয়কে দু'ভাবে দেখার সুযোগ পেয়েছি। ছাত্র হিসাবে এবং শিক্ষক হিসাবে। এই সৌভাগ্য খুব কম জনেরই হয়। এই অভিজ্ঞতা থেকে বলতে পারি যে, শুধু অতীত ও বর্তমানেই নয়, ভবিষ্যতেও এরূপ দক্ষ অধ্যক্ষ ও সকলের সহযোগিতা এই মহাবিদ্যালয়কে একদিন এই রাজ্যের অন্যতম স্থানে পৌঁছে দেবে।

আমার ভালবাসার রসায়ন বিভাগ

ডঃ কৃশানু সরকার

২০০৮ সালের জুলাই মাস। আমি তখন ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েসন ফর দি কালটিভেশন অফ্ সায়েন্স-এ গবেষণা করছি। বাড়িতে চিঠি এলো যে, আমি আরামবাগ নেতাজী মহাবিদ্যালয়ে চাকরি পেয়েছি। সেই মতো ১৫ই জুলাই সকাল ১১টার সময় এই কলেজে এলাম চাকরিতে যোগ দিতে। বাড়ি আমার কলেজের কাছাকাছি হলেও এর আগে এই কলেজে কোনোদিন আসা হয়নি। কলেজে ঢুকেই কলেজের কলেবর দেখেই ভাবলাম, বাপরে এতো বড়ো কলেজ, এতো ছাত্র-ছাত্রী, মনের ভিতরে কেমন যেন একটু ভয় হলো। যাইহোক অধ্যক্ষ মহাশয়ের রুমের দিকে যাচ্ছি, এমন সময় রুমের সামনেই এক তরুণ স্যারের সাথে দেখা হল এবং আমার সব কথা শুনে অধ্যক্ষ মহাশয়ের কাছে নিয়ে গেলেন এবং আমার পরিচয় দিয়ে বললেন, ইনি রসায়ন বিভাগে যোগদান করতে এসেছেন। অধ্যক্ষ ড. অসীম কুমার দে আমার সমস্ত কাগজপত্র দেখলেন এবং কলেজের বড়বাবুকে (পরেশচন্দ্র দাস, অধুনা অবসরপ্রাপ্ত) আমার যোগদানের বিষয়টি সেরে ফেলতে বললেন। যোগদান পর্ব সম্পন্ন হবার পর অধ্যক্ষ মহাশয় ঐ তরুণ স্যারের সাথে আমার পরিচয় করিয়ে দিলেন, বললেন, ইনি অমিত এস্ তেওয়ারী আপনার রসায়ন বিভাগের জৈব শাখার অধ্যাপক। অমিতবাবুর উপরই ভার পরলো আমাকে রসায়ন বিভাগে নিয়ে যাওয়ার। সেখানে গিয়ে দেখি দুজন বয়স্ক স্যার বসে আছেন। ওনারা হলেন ড. পূর্ণানন্দ চক্রবর্তী মহাশয়, তৎকালীন বিভাগীয় প্রধান (বর্তমানে অবসরপ্রাপ্ত) এবং ড. সুনীল কুমার সতপথী মহাশয় (বর্তমানে অবসরপ্রাপ্ত)। অল্প সময়ের মধ্যেই ওনারা আমাকে পিতৃসম স্নেহে আপন করে নিলেন। আমি বুঝতেই পারলাম না যে, আজ এই কলেজে প্রথমদিন। কলেজে ঢোকার সময় যে ভয় ভাবটা ছিল, সেটা কখন যেন ভালোলাগায় বদলে গেছে। এরপর একে একে বিভাগের শিক্ষাকর্মীবন্ধু প্রণবদা, প্রদীপদা, নারায়ণদা, সনাতনদা-র সাথে পরিচয় হলো এবং ওনারা প্রত্যেকেই তাঁদের নিজ গুণে আমাকে আপন করে নিলেন।

পূর্ণানন্দবাবু ভৌত রসায়ন পড়াতেন। উনি খড়্গপুর IIT থেকে পি. এইচ. ডি. করে এই কলেজে এসেছেন। ওনার প্রজ্ঞা এবং শিক্ষাদানের কৌশলের জন্য উনি ছাত্র-ছাত্রীদের খুব কাছের হয়ে উঠেছিলেন। ভৌত রসায়নের বড় বড় Deductions, কঠিন গাণিতিক সমস্যা নিমেষের মধ্যে সমাধান করে দিতেন। উনি ব্যবহারিক রসায়ন ছাত্র-ছাত্রীদের একেবারে হাতে ধরে শিখিয়ে দিতেন এবং রসায়নাগারটিকে নিজের বাড়ির থেকেও বেশি যত্ন করে রাখতেন। আজ বলতে ভালো লাগছে যে, ওনার সান্নিধ্যে আমিও অনেক কিছু শিখতে পেরেছি।

সেই সময় অজৈব রসায়ন শাখায় শিক্ষাদান করতেন ড. সুনীল কুমার শতপথী মহাশয়। বর্ধমান

* অধ্যাপক, রসায়ন বিভাগ

বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বনামধন্য প্রফেসর ড. আর. এল. দত্ত মহাশয়ের তত্ত্বাবধানে গবেষণা সম্পন্ন করেছেন। সুনীলবাবুও তাঁর নিজ ক্ষেত্রে অপ্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন। স্যারের একটি বিশেষ গুণ ছিল, যখন বাইরের কলেজের ছাত্র-ছাত্রীরা আমাদের কলেজে প্র্যাকটিক্যাল পরীক্ষা দিতে আসত, উনি Viva নেওয়ার সময় অদ্ভুতভাবে প্রতিবছর ঠিক ২-৩ জন গ্রামতুতো / পাড়াতুতো নাতি / নাতনি আবিষ্কার করে ফেলতেন। আমি যখনই কোন সমস্যায় পড়তাম ওনার কাছে গেলেই সমাধান করে দিতেন। সত্যি বলতে কি সেই ২০০৮ - ২০১৫ সাল খুবই মিস করি। তখন ক্লাসের চাপ অনেক বেশি থাকলেও দিনগুলো খুব আনন্দেই কাটতো।

বিভাগে অমিতবাবুই ছিলেন তখন কনিষ্ঠ অধ্যাপক। বর্তমানে তিনি বিভাগীয় প্রধান। উনি জৈব রসায়ন পড়ান। খুব রাশভারী মানুষ। ছাত্র-ছাত্রীরা দূর থেকে স্যার আসছেন দেখলেই নিমেষের মধ্যে সেখান থেকে পালিয়ে যেত। স্যারকে কোন কিছু জিজ্ঞাসা করার থাকলে আমাদের মাধ্যমেই সেটা করত। এই বিষয়ে একদিন অমিতবাবুকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম যে, আপনি তো আমাদের সাথে এতো মজা করেন কিন্তু ছাত্র-ছাত্রীরা এত ভয় করে কীভাবে ? উনিও এটার ঠিক সদুত্তর দিতে পারেননি। অমিতবাবু অসম্ভব গুণী মানুষ। শিক্ষাদান, প্রশাসনিক বিষয় সবই খুব সাবলীলভাবে সামলাতে পারেন।

শিক্ষাকর্মীবন্ধুদের মধ্যে প্রণবদা, প্রণব কুমার দাস ছিলেন যেন সব্যসাচী। একদিকে তিনি যেমন বিভাগীয় কাজ দক্ষ হাতে সামলাতেন, তেমনি বিভাগের তথা কলেজের সাংস্কৃতিক দিকটাকেও সমভাবে দেখতেন এবং আজও দেখেন। আবার কোথায় গ্যাস লাগবে, কোথায় পাতিত জল লাগবে, কোথায় মঞ্চ বানাতে হবে, ২১শে ফেব্রুয়ারির ফেস্টুন বানাতে হবে - এরকম হাজারো বিষয় প্রণবদা খুব দক্ষতার সাথেই সম্পন্ন করেন।

সেই সময় আংশিক সময়ের শিক্ষক হিসাবে বিভাগে পার্থ দে (জৈব রসায়ন শাখা) , রাজকুমার দে (অজৈব রসায়ন শাখা) শিক্ষাদান করতেন। তবে কিছুদিনের মধ্যে দুজনেই পূর্ণ সময়ের শিক্ষক হিসাবে স্কুলে যোগদান করেন।

পূর্ণানন্দবাবু ও সুনীলবাবুর অবসর আমাদের কাছে যতটা বেদনাদায়ক হয়েছিল, ঠিক ততটাই আনন্দদায়ক হলো যখন দেখলাম সুনীলবাবুর মেয়ে ড. স্মিতা শতপথী ওনার পোস্টেই এখানে যোগদান করল। স্মিতার কথা একটু বলে রাখি। স্মিতা এই কলেজেরই ছাত্রী, বর্তমানে আমার সহকর্মী। স্মিতা খুবই মেধাবী ও দায়িত্বপরায়ন এবং সুনীলবাবুর মতোই অজৈব রসায়ন শাখার অধ্যাপিকা। এরপর কিছুদিনের মধ্যেই ড. সতীনাথ সরকার এই বিভাগে যোগদান করেন এবং অমিতবাবুর সাথে জৈব রসায়ন শাখার দায়িত্ব নেন। কৌশিক ঘোষও স্মিতার মতো এই কলেজের ছাত্র। বর্তমানে ভৌত রসায়ন শাখায় শিক্ষাদান করছে। কৌশিক ছাড়াও মৌসুমি মণ্ডলও একই শাখায় শিক্ষাদান করে চলেছেন। এছাড়া শিক্ষাকর্মীবন্ধুদের মধ্যে প্রসেনজিৎ গাঙ্গুলি, মেঘনাদ পাত্র ও প্রণবদা বর্তমানে রসায়ন বিভাগের হাল ধরেছেন। এর মাঝখানে বিভিন্ন

সময়ে আমাদেরই ছাত্র-ছাত্রীরা যেমন মুক্তি দে, চন্দনা শাসমল, তুলিমা মণ্ডল, পাপিয়া সাঙ্কি, শুভ্রশঙ্খ দাস এই বিভাগে শিক্ষাদান করে গেছে। শিক্ষাকর্মী বন্ধুদের মধ্যে অমরনাথ অধিকারী (বর্তমানে অবসররত) কিছুদিনের জন্য এই বিভাগের দায়িত্ব পালন করেছেন।

প্রতিদিনের পড়াশোনা ছাড়াও সেইসময় ৫ই সেপ্টেম্বরের অনুষ্ঠান নিজ নিজ বিভাগে ছাত্র-ছাত্রীরা উদ্‌যাপন করা শুরু করেছে। সেখানে ছাত্র-ছাত্রীরা তাদের সাংস্কৃতিক গুণের বিকাশ ঘটানোর একটা মঞ্চ পেত। কেউ কবিতা আবৃত্তি, কেউ বা গান, কেউ নৃত্য পরিবেশন যেমন করত তেমনই প্রতিবছর প্রণবদার তত্ত্বাবধানে ছাত্র-ছাত্রীরা একটা নাটক মঞ্চস্থ করত। এই প্রসঙ্গে মনে পড়ে গেল আরো একটা বিষয়ের কথা। বিগত ৫-৬ বছর ধরে লক্ষ্য করছি ছাত্র-ছাত্রীরা তাদের শিক্ষক-শিক্ষিকাদের মিমিক্রি করে শিক্ষক দিবসে তাদের শিক্ষক-শিক্ষিকাদের উপহার দিচ্ছে। আমরা ক্লাস নেওয়ার সময় নিজেদের অজান্তে কিছু চারিত্রিক অঙ্গভঙ্গি বা অভ্যাসবশতঃ যেসব কথা ব্যবহার করে থাকি, সেগুলিকে নকল করে আমাদের সামনেই উপস্থাপনা করে আমাদের হাসির উদ্রেক ঘটায়। এই অনুষ্ঠানে অন্যান্য বিভাগের শিক্ষক-শিক্ষিকারাও আসতেন। বিশেষ করে পদার্থবিজ্ঞান বিভাগের প্রধান ড. বিনয় মালাকার স্যার প্রতিবারই আসতেন এবং অনুষ্ঠানে ওনার সেই বিখ্যাত গান "রঞ্জনা আমি আর আসব না ..." আমরা উপভোগ করতাম।

বিভাগের শিক্ষামূলক ভ্রমণের কথা না বললেই নয়। প্রায় প্রতিবছরই আমরা ছাত্র-ছাত্রীদের নিয়ে বিভিন্ন উচ্চশিক্ষা কেন্দ্র যেমন - IIT, ISM তে নিয়ে যেতাম। সেখানে সেমিনারের সাথে সাথে বিভিন্ন Advanced Level Instrument-এর সাথে পরিচয়, তাদের কার্যপদ্ধতি ছাত্র-ছাত্রীদের সামনে উপস্থাপনা করা হতো। এই বিষয়টি ছাত্র-ছাত্রীদের বহির্জগতের সাথে অন্তর্নিহিত জ্ঞানের সংযুক্তি ঘটাতো। এই শিক্ষামূলক ভ্রমণ বিষয়টি কলেজের মাননীয় অধ্যক্ষ ড. অসীম কুমার দে মহাশয় এবং উপাধ্যক্ষ ড. বিশ্বনাথ গরাই মহাশয় খুবই গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করেন এবং প্রত্যেক বিভাগের ছাত্র-ছাত্রীরা যাতে যেতে পারে তার ব্যবস্থা করেন। কারণ ওনারা শুধু পুঁথিগত বিদ্যা অর্জন করে জ্ঞানের সম্পূর্ণ বিকাশ ঘটানো যে সম্ভব নয়, সেটা উপলব্ধি করেন এবং যথাযথ ভাবেই বিভাগীয় শিক্ষক-শিক্ষিকা ও ছাত্র-ছাত্রীদের উৎসাহ দেন।

এই রসায়ন বিভাগ তথা নেতাজী মহাবিদ্যালয় এখন আমাদের জীবনের একটা অংশ হয়ে উঠেছে। যখন দেখি কলেজের এই রসায়ন বিভাগ থেকে পাশ করে বর্তমানে বিভিন্ন সরকারি, বেসরকারি প্রতিষ্ঠান, শিক্ষাকেন্দ্র (বিশ্ববিদ্যালয়, কলেজ, স্কুল ইত্যাদি) ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠানে আমাদের ছাত্র-ছাত্রীরা কর্মরত ও বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করছে, তখন সত্যিই গর্ববোধ হয়। এইভাবেই আমার ভালোলাগার রসায়ন বিভাগ কীভাবে যে ভালোবাসার বিভাগে পরিবর্তিত হয়ে গেছে তার ধাপগুলো দেখতে না পেলেও সেটা মর্মে মর্মে উপলব্ধি করি।

ফিরে দেখা ঃ নেতাজী মহাবিদ্যালয়

ড. মহামায়া লাহা মুখার্জী

২০০৬ সাল। সেটা ছিল জুলাই মাস। পি. এইচ. ডি ডিসার্টেশন জমা দেওয়ার তুমুল ব্যস্ততা তখন। সি. এস. সি. জানান দিয়েছে স্কুলের দিনগুলো এবার শেষ। সপ্তাহান্তে বর্ধমানের বাড়িতেই ছিলাম। এমনই এক রবিবাসরীয় সকালে কলেজের চিঠি হাতে হাজির আমাদের উদয়দা, শ্রী উদয়চাঁদ কুণ্ডু। জানলাম নেতাজী মহাবিদ্যালয়, আরামবাগ হতে চলেছে আমার নতুন কর্মস্থল। হুগলী জেলা বলতে ধারণা ছিল চন্দননগর-চুঁচুড়া-হুগলী। কিন্তু আরামবাগ ? সে তো রোজ বাস ! আসানসোলের শিল্পশহর থেকে আরামবাগে এসে পড়ার প্রাথমিক ধাক্কা কাটিয়ে ২রা আগষ্ট, ২০০৬ কলেজে যোগদান। তারপর বাসপথেই আজ ১৭ বছরের ইতিহাস।

কলেজে প্রথমদিন এলাম উদয়দার সাথে। স্টাফরুম তখন একতলায়, আজ যেখানে উদ্ভিদবিদ্যা বিভাগ। সঙ্গে লাগোয়া উপেনদার এক চিলতে চায়ের দোকান, চা-বিস্কিট আর ব্রেড-বাটারে ক্যান্টিনের ক্ষুদ্র সংস্করণ। তবে বৃদ্ধ উপেনদার চায়ে স্নেহপদার্থের আধিক্য থাকায় এখানে চায়ের আসর ছিল বেশ আকর্ষণীয়। প্রথমদিন চা-পর্ব সেরে কাজে যোগদান। আমার ভূগোল বিভাগ। স্বাগত জানালেন তৎকালীন বিভাগীয় প্রধান ড. পরমার্থ ঘোষ। সঙ্গে ছিলেন আংশিককালীন অধ্যাপক শ্রী সিন্টু মণ্ডল এবং পরীক্ষাগার পরিচারক শ্রী প্রসেনজিৎ রায়। একদিকে জানলায় উঁকি দিচ্ছে কৃষ্ণচূড়া, অন্যদিকে বেতসকুঞ্জ, এমন প্রকৃতিঘেরা পরিবেশে বেশ মানানসই আমাদের ভূগোল বিভাগ। প্রথমদিন পরমার্থদা বাড়ি ফেরার সঙ্গী করে দিলেন প্রাণীবিদ্যার অধ্যাপক অনিতাদিকে। প্রথম দেখাতেই 'তুই', কি আন্তরিক তাঁর ব্যবহার। আরও দুই প্রবীণ অধ্যাপক রাষ্ট্রবিজ্ঞানের শক্তিদা ও প্রাণীবিদ্যার তরুণদার স্নেহস্পর্শও মিলেছিল খুব সহজেই। ধীরে ধীরে পরিচিত হলাম অন্যান্য অধ্যাপকদের সাথে। আপন হতে শুরু করল আরামবাগ।

১৯৪৮ খ্রীঃ হুগলীর এই প্রত্যন্ত অঞ্চলে প্রতিষ্ঠিত কলেজটির ছাত্র ও শিক্ষক সংখ্যার আধিক্য নামজাদা শহুরে কলেজগুলির কাছেও বেশ ঈর্ষণীয়। ঈর্ষণীয় এর গুণগত মানেও। তবে দীর্ঘ প্রায় পঞ্চাশ বছর এই মহাবিদ্যালয়ের চেহারায় ছিল গ্রাম্যতা ও দারিদ্রের ছাপ। নবীন অধ্যক্ষ মহাশয় ড. অসীম কুমার দে-র আন্তরিক প্রচেষ্টায় পরিকাঠামোগত দ্রুত উন্নয়নে কলেজটির আমূল রূপবদল ঘটে যায় ২০০৬ সালে। এসময় কলেজগুলির সার্বিক গুণমান নির্ধারণের জন্য শুরু হয় NAAC কর্তৃক মূল্যায়ন প্রক্রিয়া। পিছিয়ে থাকল না নেতাজী মহাবিদ্যালয়। প্রথম NAAC ২০০৭ সালের মার্চ মাসে। প্রতিটা বিভাগ তৎপর তাদের উৎকর্ষের প্রমাণ

* অধ্যাপিকা, ভূগোল বিভাগ

দিতে। কলেজের প্রশাসনিক ভবন তথা নতুন বিল্ডিংয়ের দোতলায় স্থানান্তরিত হল স্টাফরুম। এছাড়া কর্পোরেট ধাঁচে অফিসঘর, সুসজ্জিত ক্যান্টিন, ছাত্রীনিবাস ও নবনির্মিত ৪০০ আসনের শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত প্রেক্ষাগৃহ কলেজের চেহারায় নিয়ে এল জৌলুস ও আধুনিকতার ছোঁয়া। মার্চের ২১-২২ সেই পরমলগ্ন। চরম ব্যস্ততায় সকাল থেকে রাত্রি কাটল কলেজে। প্রথম প্রচেষ্টায় কলেজের মান হল B++ গ্রেড।

আট বছর পর দ্বিতীয় দফা NAAC ২০১৫ সালের মে মাসে। এবার সংযোজন হল বেশ কয়েকটি নতুন বিভাগ - বি. বি. এ., বি. সি. এ., সানতালি, সঙ্গীত, শিক্ষা ও শারীর শিক্ষা বিভাগ। চালু হল বাংলায় স্নাতকোত্তর। সুসজ্জিত গ্রন্থাগার, নতুন ছাত্রনিবাস, আদিবাসী ছাত্রীনিবাস, প্রতিটা বিভাগের জন্য একটি কম্পিউটার ও ইন্টারনেট সংযোগসহ পৃথক কক্ষের ব্যবস্থা, ফুল-ফল-ঔষধি গাছে কলেজ প্রাঙ্গনে সবুজায়ন - এতদসত্ত্বেও কলেজের মান একই থাকল। আবারও B গ্রেড। তবে নেতাজী মহাবিদ্যালয় থেমে নেই। জোর কদমে শুরু করেছে তৃতীয় দফা NAAC-এর প্রস্তুতি। উন্নয়নের প্রচেষ্টা চলছে নিরন্তর, ছাত্র-অধ্যাপক-প্রশাসন সকল তরফেই।

স্বাধীনতার ঠিক পরেই (১৯৪৮ খ্রীঃ) গুটিকয় বিভাগ ও খড়ের চালাঘর নিয়ে যাত্রা শুরু এই মহাবিদ্যালয়ের। আজ ৭৫ বছর পর ২৪টি বিভাগ, শতাধিক অধ্যাপক, ৫০০০-এর বেশি ছাত্র-ছাত্রী এবং বৃহদাকার কয়েকটি বিল্ডিং কলেজটির বিপুল উন্নতির পরিচয় বহন করে। এখান থেকে বহু ছাত্র-ছাত্রী প্রতি বছর বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে উচ্চশিক্ষা লাভের সুযোগ পায়। তাদের অনেকেই আজ দেশে-বিদেশে কর্মরত ও গবেষণারত। তবে শুধুমাত্র সিলেবাস ভিত্তিক পুঁথিগত পঠন-পাঠনই নয়, ছাত্র-ছাত্রীদের দেহ-মনের সার্বিক বিকাশের জন্য এখানের শরীরচর্চা ও সাংস্কৃতিক চর্চার দিকগুলিও বিশেষভাবে নজর দেওয়া হয়। সারাবছর জুড়েই কলেজে থাকে সংস্কৃতি চর্চার আবহ।

জানুয়ারী মাস, কলেজে উৎসবের মাস। শিক্ষক, ছাত্র ও সকল কর্মী মিলে ২৩শে জানুয়ারী নেতাজী জন্মজয়ন্তী পালন এ মহাবিদ্যালয়ের ঐতিহ্য ও পরম্পরা। পতাকা উত্তোলন, মাল্যদান, বক্তৃতা, কুচকাওয়াজ, দেশাত্মবোধক গান ও পাঠ সহযোগে শহর পরিক্রমা এবং দুপুর বারোটায় নেতাজীর জন্মমুহূর্তে শব্দবাজি, প্রদীপ প্রজ্জ্বলন, বেলুন ওড়ানোর মধ্যে দিয়ে দিনটিকে উদ্‌যাপন করা হয়। জানুয়ারী মাসের অপর আকর্ষণ হল বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা। সকালে মশাল দৌড় শেষ হলে অধ্যক্ষ মহাশয় কলেজ প্রাঙ্গনে ক্রীড়া প্রতিযোগিতার উদ্বোধন করেন। শীতের কড়া-মিঠে রোদে ছাত্র ও ছাত্রীদের দৌড়, হাইজাম্প, লংজাম্প, থ্রো, তীরন্দাজী, যোগা ও সবশেষে মিউজিক্যাল চেয়ার প্রতিযোগিতা উপভোগ করা ও প্রতিযোগীদের উৎসাহিত করার মধ্যে এক অদ্ভুত আনন্দ। তবে অবাক হই আজও মাঠে নবুতিপর তরুণ অধ্যাপক শ্রী দুলালচন্দ্র মাল মহাশয়ের স্বচ্ছন্দ বিচরণ ও ক্রীড়া পরিচালনায় তাঁর অদম্য উৎসাহ দেখে। দিনটি আরও মনোগ্রাহী হয়ে উঠত

যদি, ছাত্রদের পাশাপাশি শিক্ষকদেরও এই প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণের সুযোগ থাকত।

জানুয়ারীর শেষে সরস্বতী পুজো, নবীন ছাত্র বরণ, মার্চে বসন্তোৎসব, মে মাসের প্রখর দাবদাহে রবীন্দ্রজয়ন্তী, সেপ্টেম্বরে শিক্ষকদিবস, শারদোৎসব ও ডিসেম্বরে সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা - বয়ে চলে উৎসব লহরী। এরই মধ্যে চলে গ্রীষ্মাবকাশে পরীক্ষা উৎসব আর জুলাই-আগস্টের হাঁস-ফাঁস গরমে নিরবসর ক্লাস। সেপ্টেম্বরে আসে ছাত্র-শিক্ষক বন্ধনের পবিত্রতম দিন, ৫ই সেপ্টেম্বর, শিক্ষক দিবস। এদিন বিভাগে-বিভাগে সাংস্কৃতিক উৎকর্ষের প্রতিযোগিতা, রং-বেরং-এর পোষাকে, নাচে-গানে-নাটকে-কোলাহলে উৎসব মুখরিত কলেজ প্রাঙ্গন। শিক্ষক ও ছাত্রের সক্রিয় অংশগ্রহণে শ্রদ্ধাজ্ঞাপন ও আশীর্বাদদানের প্রক্রিয়াটি নীরবে গুরু-শিষ্যের বন্ধনকে আরও সুদৃঢ় করে তোলে। প্রাক্তন ছাত্রদের আগমনে দিনটি আরও মধুর হয়ে ওঠে। এই শুভদিনেই বিভাগে-বিভাগে উন্মোচিত হয় দেওয়াল পত্রিকা, উন্মোচিত হয় ছাত্রদের প্রতিভা।

এরপর আক্টোবরে কাশ-শিউলি নিয়ে আসে শারদোৎসবের বার্তা। আর নৃত্য-গীত মুখর একটি দিন ব্যস্ত জীবনে আনে অবকাশ, পুজাবকাশ। নভেম্বরে কলেজ খুলেই অধ্যক্ষ মহাশয়ের সাথে ঘন ঘন বৈঠক, পাহাড় না সমুদ্র কোথায় হবে শিক্ষামুলক ভ্রমণের স্থান। অধ্যক্ষ মহাশয় নিপুণ হস্তে প্রতিটা বিভাগের প্রয়োজন ভিত্তিক ভ্রমণের ব্যবস্থা করেন। বছর শেষে ডিসেম্বরে দুদিন ব্যাপী সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতায় রবীন্দ্র-নজরুল-ধ্রুপদী-লোক সঙ্গীত ও নৃত্য, শ্রুতিনাটক, আবৃত্তি, বিতর্ক, তাৎক্ষণিক বক্তৃতা, প্রবন্ধ পাঠ, পোস্টার, ক্যুইজ সহযোগে ছাত্র-ছাত্রীদের সাংস্কৃতিক প্রতিভা বিকাশের উৎসবটির উন্মাদনা থাকে চরমে। মুগ্ধ হই, গর্বিত হই, ছাত্রদের প্রতিভায়।

সাংস্কৃতিক চর্চা ছাড়াও শিক্ষামুলক ভ্রমণের মাধ্যমে ছাত্রদের অভিজ্ঞতাভিত্তিক শিক্ষালাভকে জনপ্রিয় করে তুলতে প্রতিটি বিভাগই বিশেষ যত্নবান। প্রকৃতি পাঠ ও অবসর বিনোদন ছাড়াও এসময় ছাত্র-ছাত্রীরা নিকটবর্তী কোনো বিশ্ববিদ্যালয়, গবেষণাকেন্দ্র বা আই আই টি-র মতো শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে আয়োজিত আলোচনাচক্রে যোগদানের সুযোগ পায়। সমৃদ্ধ হতে থাকে তাদের অভিজ্ঞতার ভাণ্ডার। ভূগোল পড়ানোর সুবাদে ছাত্রদের প্রকৃতি-পাঠ, নমুনা সংগ্রহ ও ক্ষেত্রসমীক্ষা শেখাতে প্রতি বছর শিক্ষামুলক ভ্রমণে আমারও খুব কাছ থেকে ছাত্র-ছাত্রীদের সাথে মেশার সুযোগ ঘটে। কারো প্রথম পাহাড় দর্শন, কারো বা প্রথম ট্রেন চড়ার উত্তেজনা। সারাদিন সতীর্থদের সান্নিধ্যে আনন্দ ও উচ্ছ্বাস বাঁধন হারা। কদিন একসাথে থাকায় ছাত্রদের প্রতি স্নেহের নজরদারী, অন্যদিকে ওদের আনন্দযজ্ঞে অংশীদার হয়ে ছাত্র-শিক্ষক সম্পর্কটি হয়ে ওঠে আরও মধুর ও গভীর। তবে এই কলেজে ভূগোলের শিক্ষামুলক ভ্রমণের বরাবরের সঙ্গী পরিবেশ বিজ্ঞান ও উদ্ভিদ সংরক্ষণ বিভাগ। আজও তাই স্মৃতি ভারাক্রান্ত হয়ে আসে আমার। উত্তরবঙ্গ, সিকিম, জব্বলপুর ভ্রমণের সঙ্গী ভূগোলের পরমার্থদা, উদ্ভিদ সংরক্ষণ বিদ্যার আশিসদা কিংবা পরিবেশ বিজ্ঞানের শিক্ষক তীর্থ-সামিম-তিথির সাথে

কাটানো সুন্দর অতীত মুহূর্তগুলির নস্টালজিয়ায়। মাঝরাতে জঙ্গল সাফারি, কাকভোরে লাটাগুড়ির জঙ্গলে পাখির কূজন, নেপালে ক্যাসিনো প্রভৃতি টুকরো টুকরো স্মৃতি আজও বড় সতেজ। এমন আন্তঃবিভাগীয় ভ্রমণ ছাত্র-ছাত্র, ছাত্র-শিক্ষক ও শিক্ষক-শিক্ষকের বন্ধনকে সুদৃঢ় করে তোলে।

সারাবছর ছাত্র-ছাত্রীদের পাঠদান ও মহাবিদ্যালয়ের সার্বিক উন্নয়নে নিবেদিত শিক্ষকদের একঘেয়ে জীবনে মুক্ত বাতাস ও প্রাণের হিল্লোল আনতে এই কলেজের সপরিবারে শীতকালীন বনভোজনের রীতিটি অনন্য। ২০০৬ সালে আমার প্রথম বনভোজন বাঁকুড়ার জয়পুরে। এরপর বারে বারে বনভোজনের স্থান হিসাবে ফিরে এসেছে শাল-পিয়ালের এই জঙ্গলটি। কিন্তু পুনরাবৃত্তিতে কখনও পুরোনো হয়নি জয়পুর, চাতরা কিংবা বিষ্ণুপুর। কারণ এদিন নবীন-প্রবীণ, অধ্যক্ষ-অধ্যাপকের প্রাচীর ভেঙে সবাই মেতে উঠি আনন্দে। আসর জমাতে আগে ছিলেন অনিতাদি, প্রণবদা, তরুণদা; ব্যাটন এখন নৃত্য-গীত পারদর্শী তরুণ অধ্যাপকদের হাতে। তবে ইংরাজীর অধ্যাপক উদয়দা যখন একে একে সবার হাতে মাইক তুলে বলেন 'কিছু করো' তখন আমাদের মতো অপটুরাও গেয়ে উঠি দু'কলি, বলে ফেলি দু-চার কথা। সব মিলে যে নির্মল, আনন্দঘন পরিবেশ সৃষ্টি হয় তারই টানে বারবার বনভোজনে যাওয়া। আর বনভোজনের স্থান যদি হয় গনগনি, ভূগোল খচিত ক্যানভাসে তখন বাড়তি রক্তচঞ্চলতা। সত্যিই অনবদ্য ছিল এবারের বনভোজন, গনগনির চড়াই-উৎরাই খোয়াইভূমি জয়ের মাদকতায়।

সবশেষে বলি, আরামবাগের আধা শহর এই কলেজটির প্রাণপ্রাচুর্য ও সহকর্মীদের সৌহার্দ্য আজকের ব্যস্ত পৃথিবীতে সত্যিই দুর্লভ। সিবিসিএস সিস্টেমে সারাবছর ছাত্র-ছাত্রী পরিবৃত থাকার ফাঁকে সহকর্মীদের সাথে খুনসুটি, কিংবা বিনয়দার ডাকে ক্যান্টিনে চায়ের তুফান বা গান-আড্ডা, আবার কোনো শিক্ষক বন্ধুর জন্মদিনে সামান্য আয়োজনে তাকে চমকে দেওয়ার আনন্দ হাতছাড়া করা যায় না। এই ভালোবাসার টানেই বারে বারে ফিরে আসেন প্রাক্তন ছাত্র বা শিক্ষকেরা কলেজে কোনো উৎসবকে কেন্দ্র করে। প্লাটিনাম জুবিলি বর্ষের একটি বড় প্রাপ্তি তাই প্রতিটা বিভাগের ছাত্র-শিক্ষকের পুনর্মিলন উৎসবটি। সমানতালে চলতে থাকুক দৈনন্দিন পাঠদান, সেমিনার, ওয়ার্কশপ ও সাংস্কৃতিক উৎসব। শ্রীবৃদ্ধি হোক নেতাজী মহাবিদ্যালয়ের। এই সঙ্গে কামনা করি ৭৫ বছর পূর্তি অনুষ্ঠানের জাঁকজমক দাগ রেখে যাক স্থানীয় গরিব মানুষগুলোর মনেও। প্রদীপের তলার আঁধার ঘুচিয়ে বন্যা বিপর্যস্ত, দরিদ্র কালিপুরবাসীর মনে উচ্চশিক্ষার আলোকবর্তিকা নিয়ে হাজির হোক এই মহাবিদ্যালয়। উপকৃত হোক পিছিয়ে পড়া সমাজ। শুধু NAAC-এর বিচারে 'A' গ্রেড না, মানুষের বিচারে, মানুষের ভালোবাসায় সমৃদ্ধশালী হোক নেতাজী মহাবিদ্যালয়।

শিক্ষকের চোখে শিক্ষাঙ্গন

রামানুজ মুখোপাধ্যায়

উপেনদার চা'র দোকান। ক্লাস নেওয়ার পর শিক্ষকদের প্রাণ জুড়ানো আর নিঃশ্বাস নেওয়ার জায়গা ছিল। বড় আম গাছের একপাশে একটা ছোট ঘর। উপেনদার কাঁপা হাতের চা খেতে গেলাম সিনিয়র এক অধ্যাপকের সাথে, এই কলেজে পড়াতে আসার প্রথমদিন, বেশ দুরু দুরু বুকে। কালের অন্তরালে উপেনদার দোকানটা অধিকারভুক্ত হল বোটানি ডিপার্টমেন্টের, আর আমরা সবাই সাক্ষী হয়ে রইলাম উন্নতির সোপান বেয়ে গড়ে ওঠা আধুনিক ক্যান্টিনের। ঠিক এইভাবেই কলেজের প্রতিটা ক্ষেত্র ধীরে ধীরে গড়ে উঠলো বর্তমান অধ্যক্ষ ড. অসীম কুমার দে-র সুদক্ষ, সুচিন্তিত প্রশাসনিক দক্ষতায়। নেতাজী মহাবিদ্যালয় নিজেকে বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্যতম সেরা কলেজে হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করে নিল। কম্পিউটার বিজ্ঞান (Computer Science), পরিবেশ বিজ্ঞান (Environmental Science) , BBA, BCA বিষয় সাম্মানিক স্তরে অন্তর্ভুক্ত করা যেমন অধ্যক্ষ মহাশয়ের আধুনিক দূরদৃষ্টিকে প্রতিভাত করে, ঠিক তেমনই সাঁওতালি (Santali) বিষয়টা স্নাতক (সাম্মানিক) স্তরে অন্তর্ভুক্ত করা তাঁর সামাজিক দায়বদ্ধতার নিদর্শন প্রদান করে। একজন শিক্ষক হয়েছিলাম আই. টি-র ঝাঁ চকচকে লোভনীয় চাকরি ছেড়ে কিছুটা ভালো লাগা, দায়বদ্ধতা থেকে। এখানে এসে সাঁওতালি (Santali) বিষয়টা স্নাতকস্তরে অন্তর্ভুক্ত করানোর জন্য প্রশাসনিক দর্শন আমি অধ্যক্ষের কাছ থেকে শুনেছিলাম। আমি ভীষণ আবেগাতুর হয়েছিলাম সেদিন। দিল্লীতে MBA-র ক্লাসে এক অধ্যাপকের কাছে শুনেছিলাম "Emotion is the root of Innovation "। অধ্যক্ষ মহাশয়ের সেদিনের ব্যাখ্যা শুনে মনে হয়েছিল স্যার সেদিন MBA-র ক্লাসে ঠিক কথাই বলেছিলেন।

আমার ভাবনায় অবশ্য মনে হয়, নেতাজী মহাবিদ্যালয়ের এই সার্বিক উন্নতি শুধুমাত্র অধ্যক্ষের প্রশাসনিক দক্ষতার ফলশ্রুতি নয়, উন্নতির সোপান অতিক্রমে এক ঝাঁক কর্মঠ, সৎ, পরিশ্রমী অধ্যাপকের কর্মযজ্ঞকে বোধহয় কোনমতেই উপেক্ষা করা যায় না। অধ্যাপক উদয় কুমার নন্দী, পরমার্থ ঘোষ, গোপালচন্দ্র সিনহা, তারকনাথ রায়, বিশ্বনাথ গরাই (বর্তমান উপাধ্যক্ষ) সহ আরো অনেকে যেভাবে এই মহাবিদ্যালয়ের উন্নতির সোপান অতিক্রম করে নিজেদের সর্বদা উজাড় করে দিয়েছেন বা আজও দিয়ে থাকেন তা আমার কাছে আজও অনুকরণীয়। কালের তরণী বেয়ে আমিও পরবর্তীতে এই কিছু কিছু কর্মযজ্ঞে তাদের সাথে সামিল হয়েছিলাম। আমি কতটুকু দিতে পেরেছি জানি না, কিন্তু এঁদের সান্নিধ্যে শিখেছি অনেক। তাঁরা যে আদরে, যে ভালোবাসায় আমাকে দিয়ে কাজ করিয়ে নিয়েছেন, তা তাঁদের মহত্ব ও উদারতার বহিঃপ্রকাশ।

* শিক্ষক, কম্পিউটার বিজ্ঞান বিভাগ

তাঁরা কখন যে আমার কাছে সিনিয়র অধ্যাপক থেকে 'দাদা' হয়ে উঠেছেন আমার অজান্তে টের পাইনি তা। আমার আনন্দের সীমা নেই। এই উন্নতির সাগরে সেতুবন্ধনে কাঠবেড়ালি হয়ে উঠেছি। তাঁরা কিন্তু আমার এই অদক্ষতার হাতকে আস্তে আস্তে দক্ষতার কষ্টিপাথর দিয়ে নতুন করে গড়ে তুলেছেন, তাই কুণ্ঠিত আমি, ভাবনায় আসে -

"গ্রহণ করেছ যত,
ঋণী তত করেছো আমায়।"

একটা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সার্বিক উন্নতি নির্ভর করে প্রশাসনিক ব্যবস্থাপনা ও তার সঙ্গে সঙ্গে একাডেমিক উন্নতি। এই মহাবিদ্যালয়ে ২১টি বিষয় সাম্মানিক স্নাতক স্তরে পড়াশোনা হয়। তাই কেন্দ্রীয়ভাবে প্রত্যেকটি বিষয়ের বিভাগকে দেখভাল করা সুষম হবে না - এটা ভেবেই অধ্যক্ষ মহাশয়ের আর এক সুচিন্তিত পদক্ষেপ, প্রত্যেক বিষয়ের বিভাগগত স্বায়ত্ব শাসন প্রদান করা। প্রশাসনিক নিরিখে এ এক অভুতপূর্ব সিদ্ধান্ত। প্রত্যেক ডিপার্টমেন্ট তাদের নিজেদের মতো করে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারে, তাদের উন্নতির জন্য। তারা প্রত্যেকে দায়বদ্ধ অধ্যক্ষ মহাশয়ের কাছে। পড়াশোনার পরিবেশে নিজেদের এই যে স্বাধীনতা, তা প্রত্যেক ডিপার্টমেন্টের যেমন কাজ করার সুবিধা, তেমনই কর্মযজ্ঞের কুক্ষিগত পরিবেশ ছেড়ে উদার কর্ম পরিবেশের উদ্ভাসন। কি নেই এই মহাবিদ্যালয়ে - আধুনিক পঠন-পাঠন কক্ষ, বিশাল লাইব্রেরি, ৪২০ জনের বসার অডিটোরিয়াম সহ খেলার মাঠ, জিমন্যাসিয়াম, ইনডোর গেমের জন্য স্পোর্টস কমপ্লেক্স সহ অনেক সুবিধা। সবই টিনের চালের কক্ষ থেকে ধীরে ধীরে গড়ে ওঠা।

এত সুবিধা আছে বলেই শিক্ষক হিসাবে বোধহয় আত্মসমালোচনার প্রয়োজন। যা পেয়েছি তার কত অংশ আমি এই কলেজকে ফেরৎ দিতে পারছি। এ আমার অহংকার, এত বড় এক কলেজে পড়াতে পারছি বলে। এ আমার অহংকার তিলে তিলে উন্নতির শিখরে ওঠা এক প্রতিষ্ঠানের অন্ত্যজ হয়ে উন্নতির শরিক হতে পেরেছি বলে। জীবনানন্দের মত শুধুমাত্র এই বাংলায় নয় - বারবার ফিরে আসতে চাই এই প্রতিষ্ঠানে, যেখানে একজন শিক্ষক হিসাবে নিজেকে ব্রতী করতে পেরেছি, যেখানে প্রশাসনিক দক্ষ একজন অধ্যক্ষের কাছ থেকে প্রশাসনিক খুঁটিনাটি বিষয় শেখার সুযোগ পেয়েছি। যেখানে এক ঝাঁক সৎ, কর্মদক্ষ মানুষের কাছ থেকে কর্মদক্ষতার পাঠ নিতে পেরেছি। তাই যেখানেই থাকি এই সঙ্গমস্থলে এসে উদাত্ত কণ্ঠে বলতে চাই -

"মোর নাম এই বলে খ্যাত হোক,
আমি তোমাদেরই লোক"।

এই মুহূর্তে দাঁড়িয়ে ভবিষ্যৎ দিনের অধ্যাপকদের কিন্তু এক বড় দায়বদ্ধতার অবতারণা করাতে চাই। যা পেয়েছি, তাকে ধরে রাখাই কিন্তু আমাদের বড় চ্যালেঞ্জ, কালের নিয়মে যাঁরা উন্নতির শিখরে পৌঁছে দিয়ে

গেলেন এই প্রতিষ্ঠান থেকে তাঁরা সরে যাবেন। পাবো না তাঁদের সান্নিধ্য, পাবো না তাঁদের উপদেশ, মতামত। কিন্তু তবুও অতীতের সেই শিক্ষাকে পাথেয় করেই আমাদের রচনা করতে হবে ভবিষ্যতের উন্নতির মসৃণ পথ - যেখানে মতান্তর থাকতে পারে কিন্তু মনান্তরকে প্রশ্রয় দেওয়ার কোন স্থান নেই। যেখানে আত্মগরিমা নয়, সার্বিকতাই হবে একমাত্র লক্ষ্য - তবেই বর্তমান উন্নতির প্রশান্ত ছায়াকে আমরা অনেকদিন উপলব্ধি করতে পারব। এই প্রতিষ্ঠানের প্রতি সবার থাকবে এক অনুরাগের ছোঁয়া। প্রতিষ্ঠান ঢলে পড়বে না অবনতির অতল কালান্তরে। হে নাবিক সাবধান!

অধ্যাপক উদয় কুমার নন্দী IQAC (Internal Quality Assurance Cell) -কে যে পর্যায়ে তুলে নিয়ে গেছেন, তা এই প্রতিষ্ঠানের এক নবদিগন্ত উন্মোচিত করেছে। শুধু ইনফ্রাস্ট্রাকশন নয়, তাকে একাডেমিক উন্নতি সাধনে কীভাবে কাজে লাগানো যাবে তার এক রূপরেখা তৈরি হয়েছে। তাকে মান্যতা দিয়ে যদি আমরা চলতে পারি, তা হবে প্রতিষ্ঠানের উন্নয়নের মসৃণ পথ। শুরু হয়েছে প্রাক্তনীদের পদার্পণ। তাঁদের ভালোবাসায় এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের এক শুভযাত্রার সূচনা হয়েছে। ধরে রাখতে হবে তা-ও। উন্নতি সাধনের এখনো অনেক জায়গা আমরা খুঁজে নিতে পারি লাইব্রেরিতে। ছাত্রদের লাইব্রেরিমুখী করে তোলাও শিক্ষকদের বর্তমান ডিজিটাল যুগে এক বড় চ্যালেঞ্জ - যা আমাদের দায়িত্ব নিয়ে করতেই হবে। প্রাক্তন ছাত্র-ছাত্রীদের মতো আমিও একদিন প্রাক্তন শিক্ষক হব। এই প্রতিষ্ঠানের দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে মনে হবে -

"ইঁট, কাঠ, পাথরের ফাঁকেতে,
ইতিহাস ফিসফিস কথা কয়"।

মানস চক্ষে দেখতে পাবো আজও উপেনদা কাঁপা কাঁপা হাতে চা-এর গ্লাসটা এগিয়ে দিয়ে বলবে - "স্যার, চা টা"। দেখব নেতাজী মহাবিদ্যালয় আরও উন্নত।

আমার স্মৃতির পাতা থেকে

ড. তীর্থঙ্কর মল্লিক

অবশেষে চলে এলাম আরামবাগ পল্লীশ্রী মোড়ে। এখন যেতে হবে নেতাজী মহাবিদ্যালয়ে। এক দোকানদারকে জিজ্ঞেস করলাম এবং তাঁর কথা মত বাসে কালিপুর আর সেখান থেকে হেঁটে কলেজে। তখন এখনকার মতো টোটো, অটো ছিল না। বালিদেওয়ানগঞ্জের বাস না পেলে হয় পল্লীশ্রী হেঁটে বা কালিপুর থেকে হেঁটেই আসতে হত। একটি জিনিস আমাকে অবাক করেছিল, সেই আমলে অর্থাৎ ২০০৫ সালে পরিবেশ বিজ্ঞানের মতো নতুন তথাকথিত কুলহীন বিষয়ে অনার্স কোর্স চালু করার সিদ্ধান্ত। সন্দেহ ছিল শহরের কলেজগুলি যেখানে এরকম সিদ্ধান্ত নিতে ভয় পাবে, সেখানে আরামবাগের মতো মফস্বলে এই কোর্স আদৌ চলবে তো! এই প্রসঙ্গে বলি এই অনার্স কোর্স অনুমোদনের জন্য আর একজন বিশিষ্ট ব্যক্তির ভূমিকা অপরিসীম। তিনি হলেন আমার মাষ্টারমশাই বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক তথা তৎকালীন বিভাগীয় প্রধান স্বর্গীয় জয়ন্ত কুমার দত্ত মহাশয়। কিন্তু পরে বুঝতে পারি সিদ্ধান্তটি কত যুগপোযোগী ছিল। সত্যিই তৎকালীন পরিচালন সমিতি এবং অধ্যক্ষ মহাশয়ের দূরদৃষ্টির প্রশংসা করতেই হয়। বলতে গর্ববোধ করি পশ্চিমবঙ্গে এই কলেজেই প্রথম পরিবেশ বিজ্ঞানে অনার্স কোর্স চালু হয়। পরবর্তীকালে কম্পিউটার বিজ্ঞান, শিক্ষা বিজ্ঞান, B.B.A., B.C.A.-এর মতো নতুন নতুন বিষয়ে কোর্স চালু হয়। তখন কলেজের চারিদিকে কোনো পাঁচিল ছিল না। আসা যাওয়ার রাস্তা ছিল দুটি – একটি ভেষজ উদ্ভিদ উদ্যানের পাশের গেট দিয়ে। চারিদিকে কয়েকটি দোতলা ভবন যা আজকের কলেজের সাথে কোনো ভাবে না মিললেও আজকের প্রজ্জ্বলিত শিখার সলতে হয়তো অনেক আগে থেকেই পাকানো শুরু হয়েছিল। সেদিন ভালো লেগেছিল অধ্যক্ষ মহাশয়ের টেবিলে কলেজের প্রস্তাবিত প্রশাসনিক ভবনের স্কেচ দেখে। আর অবাকও হয়েছিলাম যে এরকম একটা জায়গায় আলাদা করে তিনতলা প্রশাসনিক ভবন, যার আবার সর্বোচ্চ তলায় একটি বিশাল আকৃতির প্রেক্ষাগৃহ।

পরিবেশ বিজ্ঞান পঠন-পাঠন আগে থেকেই শুরু হয়েছিল। নবাগত আমরা দুজন যোগদান করলাম। আমরা অর্থাৎ আমি এবং বিভাগীয় প্রধান আমারই সহপাঠী ড. মৌমিতা সিন্‌হা। ক্লাসে গিয়ে অবাক হওয়ার আরও বাকি ছিল। সেখানে গিয়ে দেখি ২০ জন মেধাবী ছাত্র-ছাত্রী অধীর আগ্রহে বসে আছে। ক্লাস তো শুরু হল কিন্তু ল্যাব কোথায়? আবার আলোচনা করলাম অধ্যক্ষ মহাশয়ের সাথে। তিনি বলেছিলেন, অনার্স কোর্স যখন খুলেছি তখন যথা সময়েই ল্যাবও হবে, চিন্তার কিছু নেই। সত্যিই কয়েক মাসের মধ্যেই একটি বড় ক্লাস রুমকে ল্যাব করা হল এবং প্রয়োজনীয় জিনিসপত্রও কেনা হল।

* শিক্ষক, পরিবেশ বিজ্ঞান বিভাগ

কিছুদিন পর আবার ব্যস্ততা শুরু হয়ে গেল। কারণ সামনে NAAC-এর মূল্যায়ন আছে। আমরা যাতে সঠিকভাবে সবদিক গুলিকে তুলে ধরতে পারি তারজন্য সমস্ত কাগজপত্র তৈরি করতে হবে। আমি পড়লাম বিপদে। একদিকে নতুন বিভাগ তার উপর আবার এইসব তথ্য সংগ্রহ করে তাকে ফাইল বন্দী করতে হবে। এসময় আমাদেরকে অভিভাবক সুলভ সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছিলেন কলেজের রসায়ন, উদ্ভিদ বিজ্ঞান, প্রাণী বিজ্ঞান প্রভৃতি বিভাগগুলির প্রবীণ শিক্ষক-শিক্ষিকাগণ। এঁদের অভিভাবকত্ব এবং সাহায্য ছাড়া এই বিভাগ আজকের জায়গায় পৌঁছতো না। সম্ভবত ২০০৬ সাল, কলেজের পরিচালন সমিতি এক ঐতিহাসিক সিদ্ধান্তে উপনীত হলেন। কলেজের প্রত্যেক বিভাগকে আলাদা করে দেওয়া হবে, বিভাগীয় লাইব্রেরি তৈরি হবে, শিক্ষামূলক ভ্রমণের ব্যবস্থা করতে হবে নির্দিষ্ট ক্লাসরুম থেকে। ঐতিহাসিক সিদ্ধান্ত বললাম কারণ, সেই আমলে অনেক বড় বড় কলেজ বিশেষত কলা বিভাগে এই ধরণের আলাদা ব্যবস্থা ছিল না। আবার শুরু হয়ে গেল ঘর গোছানোর পালা। প্রত্যেক বিভাগ নিজেদের মতো করে গোছাতে শুরু করলাম। ইতিমধ্যে আমাদের বিভাগে যোগদান করল আমার সহপাঠী ভাস্কর মণ্ডল। এরপর ২০০৭, NAAC মূল্যায়ন হল, আমরা যথাসম্ভব পারদর্শিতার সাথে সম্পন্ন করলাম। ২০০৮-এ যোগদান করলেন আমার আর এক সহপাঠী সৈয়দ আবুল আজফার সামিমউদ্দিন।

সময়টা ২০০৯, কয়েকদিন ধরেই ভাবছিলাম শুধু পড়ালেই হবে না, ছাত্র-ছাত্রীদের পরিবেশ সচেতন করে তুলতে হবে। যাতে তারা ভবিষ্যতে একজন সুন্দর পরিবেশ সচেতন নাগরিক হতে পারে। হঠাৎই অধ্যক্ষ মহাশয় ডেকে পাঠালেন। যাবার পর বললেন, সামনের সপ্তাহে একটি বৃক্ষরোপণ কর্মসূচী করতে হবে, ছাত্র-ছাত্রীদের উদ্যোগী করে তুলুন। TATA Chemicals Ltd.-এর আর্থিক ও কারিগরী সহযোগিতায় একটি আমবাগান তৈরি হবে। সত্যিই উনি আবার অবাক করলেন। যে যুগে আমরা ছাত্র-ছাত্রীদের পড়াচ্ছি Industry-Institute Partnership-এর কথা, তখন অধ্যক্ষ মহাশয় একে বাস্তবায়িত করছেন। এরপর পরিবেশ বিজ্ঞান বিভাগ ধারাবাহিকভাবে বৃক্ষরোপণ কর্মসূচী চালিয়ে যাচ্ছে কখনো NCC, NSS, কখনও কোনো NGO-র সহযোগিতায়। অবশ্যই কলেজ পরিচালন সমিতির সহযোগিতা ও পরিবেশ বিজ্ঞান বিভাগ ছাড়াও কলেজের অন্য সমস্ত বিভাগের অধ্যাপক ও ছাত্র-ছাত্রীদের স্বতঃস্ফুর্ত অংশগ্রহণ কলেজের ভিতরের ফলের বাগান ও বাইরে কলেজ সংলগ্ন অংশে কৃত্রিম বনাঞ্চল গড়ে তুলতে সহায়ক ভূমিকা পালন করেছিল।

স্বর্ণযুগ বোধহয় একেই বলে। সদ্য একটি U.G.C. Sponsored National Seminar organise করেছি। হঠাৎই আমারই সহকর্মী ড. সুমন্ত রায় প্রস্তাব দিলেন, বৃষ্টির জল সংরক্ষণ ও বিকল্প শক্তি হিসাবে সৌরশক্তির ব্যবহার সংক্রান্ত কোনো প্রকল্প নেওয়া উচিত। অধ্যক্ষ মহাশয়ের পরামর্শ মতো আমরা উদ্যোগ নিলাম এবং সরকারের কাছে আবেদন করলাম। এ প্রসঙ্গে বলি বিষ্ণুপুর রামানন্দ কলেজের অধ্যাপক ড.

দেবাঙ্ক শেখর মিশ্র মহাশয়ের ঐকান্তিক সহযোগিতা ছাড়া হয়তো আবেদন করা সম্ভব হতো না। ইতিমধ্যে দ্বিতীয় NAAC-এর সময় হয়ে গেল। কিছু দিনের মধ্যেই পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পরিবেশ দপ্তরের সহায়তায় District Rain Water Harvesting Model Plant টি কলেজে স্থাপিত হয়। কিছুদিন পর রাজ্য সরকার ও কেন্দ্রীয় সরকার যৌথভাবে 20 KW Grid Connected Solar PV Plantও অনুমোদন দেয়।

প্রথম শিক্ষামূলক ভ্রমণে গেলাম মাইথন ও দুর্গাপুরে সরকারি এনার্জি পার্কে। সে এক অনন্য অভিজ্ঞতা, কোনোদিন ভুলতে পারব না। এরপর মনে হল পরিবেশ বিজ্ঞানের ছাত্র-ছাত্রীদের বিভিন্ন শিল্প-কলকারখানা ঘুরে দেখা দরকার। প্রস্তাব নিয়ে গেলাম অধ্যক্ষ মহাশয়ের কাছে। তিনি উৎসাহ দিলেন। সাথে সাথে এদের সার্বিক বিকাশ ও ভবিষ্যৎ পরিকল্পনার জন্য বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ঘোরানোর পরামর্শও দিলেন। তারপর থেকে সেই ট্রাডিশান সমানে চলে আসছে। ভারতের বিভিন্ন বিখ্যাত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান যেমন - FRI, IIT, IISC, Central University, CSIR & ICAR Laboratories ও নেপালের Tribhuvan University ইত্যাদি জায়গায় ছাত্র-ছাত্রীদের নিয়ে যেতে পেরেছি। সুফলও পেয়েছি হাতে হাতে। আজ বহু ছাত্র-ছাত্রী দেশে ও বিদেশে IIT, NIT, Central University তে পড়াশোনা ও গবেষণা করছে। আবার বিভিন্ন MNC, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়ে কর্মরত ছাত্র-ছাত্রীও নেহাত কম নয়।

এদিকে মৌমিতা অন্য কলেজে যোগদান করলো। আমাদের এখানেও একে একে তিথি চ্যাটার্জী ও সুমন্ত রায় যোগদান করলেন। প্রথম থেকেই এই বিভাগে মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীর অভাব ছিল না। প্রথম ব্যাচের রেজাল্টতো খুবই ভালো। প্রায় সবাই-ই প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হয়েছিল। তাদের মধ্যে একজন ছাত্র পলাশ সামন্ত তো রেকর্ড নম্বর পেয়ে প্রথম বিভাগে প্রথম হয়েছিল। তারপর থেকে ছাত্র-ছাত্রীরা ধারাবাহিকভাবে ভালো রেজাল্ট করে চলেছে। অনেকেই বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে প্রথম, দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেছে। ২০১৭ সালে যোগদান করলেন তরুণ অধ্যাপক ড. তনুশ্রী মণ্ডল। পরবর্তীকালে বিভাগের বিভিন্ন কাজ তিনি দক্ষতার সাথে পরিচালনা করে চলেছেন।

সবশেষে বলি, সেদিনের ক্ষুদ্র পরিবেশ বিজ্ঞান পরিবার আজ বিশ্ব পরিবেশের সঙ্গে একাকার হয়ে গেছে। সেদিনের ফুটফুটে ছেলেমেয়েগুলি আজ দেশ-বিদেশের বিভিন্ন উচ্চপদে আসীন। আজ শুধু পুব আকাশে পরিবেশের সর্বশক্তির একমাত্র উৎসের দিকে তাকিয়ে বলি, আমার তথা আমাদের ছাত্র-ছাত্রীরা 'যেন থাকে দুধে ভাতে'। নেতাজী মহাবিদ্যালয়ের সর্বাঙ্গীন উন্নতির সাথে সাথে পরিবেশ পরিবারও যেন ছড়িয়ে পড়ে বিশ্ব পরিবেশের প্রতিটি কোণায় কোণায়।

নেতাজী মহাবিদ্যালয় গ্রন্থাগার ঃ উদ্ভব ও ক্রমবিকাশ

বাসুদেব অধিকারী

১৯৪৮ সালের পয়লা আগষ্ট ডাঃ রাধাকৃষ্ণ পাল এবং আরো অনেক দেশহিতৈষী, শিক্ষানুরাগী ব্যক্তিদের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় আরামবাগের দ্বারকেশ্বর নদের পশ্চিম তীরে কালিপুর গ্রামে বরেণ্য স্বাধীনতা সংগ্রামী নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুর নামে 'নেতাজী মহাবিদ্যালয়' প্রতিষ্ঠিত হয়। পায়ে পায়ে পথ চলা শুরু করে আজ তার বয়স পঁচাত্তর। শিক্ষার গুণগত মান, বিষয় সংখ্যা এবং ছাত্র সংখ্যার নিরিখে এই কলেজ আজ বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তর্ভুক্ত কলেজগুলির মধ্যে প্রথম সারির কলেজ হিসাবে বিবেচিত হয়।

এই কলেজের সঙ্গে আমার পরিচিতি খুব একটা বেশি দিনের নয়। আমি এখানে গ্রন্থাগারিক পদে যোগ দিই ২০১০ সালের ২১শে এপ্রিল। আরামবাগ এলাকার স্থানীয় বাসিন্দা না হওয়ার জন্য এই কলেজের সঙ্গে কোন পূর্ব পরিচিতির অবকাশ ছিল না। কিন্তু ২০১০ সাল থেকে শুরু করে কেটেও গেলো দীর্ঘ ১৩ বছর।

তাই বিগত ১৩ বছরের অভিজ্ঞতাকে সাথী করে কলেজের অমৃত জয়ন্তী অনুষ্ঠানের স্মরণিকার জন্য লিখতে বসেছি। এই প্রবন্ধে আমি কলেজের কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার সম্পর্কে আলোচনা করা ছাড়াও আমার ব্যক্তিগত কিছু কথা, কিছু স্মৃতি সবার সঙ্গে ভাগ করে নেব। লেখার ভুলত্রুটি নিজগুণে মার্জনা করবেন।

আমি প্রথমদিন আরামবাগ এসেছিলাম বাসে - হাওড়ার সলপ থেকে। তখনও আরামবাগের নাম ভারতবর্ষের রেল মানচিত্রে যোগ হয়নি। কলেজে যোগ দেবার পরবর্তী সাতদিন আমার ঠিকানা ছিল এখন যেখানে IQAC-র ঘর সেইখানে। আমার সঙ্গে থাকতেন একই সঙ্গে প্রাণীবিদ্যা বিভাগে যোগ দেওয়া অধ্যাপক ড. গোবিন্দচন্দ্র রায়। ঐ সাতদিন আমার রুটিন ছিল দিনে কলেজ; বিকেল ও সন্ধেবেলা বাড়ি ভাড়া খোঁজা আর রাতে কলেজের আমগাছের তলায় বসে গোবিন্দের সঙ্গে গল্প করা। এই সময় কলেজের দুজন নেপালী পাহারাদারের সঙ্গে পরিচয় হয়। যাদের মধ্যে একজনের নাম আজও মনে আছে - সুনীল। তার সঙ্গে দীর্ঘদিন যোগাযোগ ছিল। ২০১৫ সালের ভূমিকম্প এই যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন করে দেয়। অবশেষে আরামবাগ বিবেকানন্দ পল্লীর এক বাড়িতে চার বছর ভাড়া থাকার পরে বসন্তপুর রেলগেট সংলগ্ন উত্তর রবীন্দ্র পল্লী হয় আমার আরামবাগের স্থায়ী ঠিকানা। এসব কথার অবতারণা করার উদ্দেশ্য একটিই - কৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ করা যে, কলেজ প্রথমদিন থেকেই আমাকে আপন করেছিল, বাসস্থান দিয়েছিল যতদিন না অন্যত্র কিছু যোগাড় হয়।

নিজের কথা ছেড়ে এবার আসি কলেজের গ্রন্থাগার প্রসঙ্গে। উচ্চশিক্ষা প্রাঙ্গনে গ্রন্থাগারের গুরুত্ব

* গ্রন্থাগারিক, কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার

বোঝাতে গিয়ে ড. সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণন ১৯৫০ সালে প্রকাশিত বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষা কমিশনের রিপোর্টে বলেন, "Teaching is a co-operative enterprise. Teachers must have the necessary tools for teaching purpose in the form of libraries and laboratories as also the right type of students" শিক্ষকদের শিক্ষাদানের জন্য যেগুলি আবশ্যিক তার মধ্যে তিনি রাখলেন গ্রন্থাগারকে। এর গুরুত্ব বোঝাতে গিয়ে তিনি আরও বলেন, "Library is the heart of all the university's work directly"। কি শিক্ষাদানে, কি গবেষণা উভয় ক্ষেত্রেই গ্রন্থাগার হল যে কোন বিশ্ববিদ্যালয়ের হৃদয়স্বরূপ। বিজ্ঞানের গবেষণা এবং সমাজ ও কলা বিষয়ক গবেষণা উভয় ক্ষেত্রেই গ্রন্থাগারের ভূমিকা বোঝাতে গিয়ে তিনি বলেন, "while scientific research needs a library as well as its laboratories (সুধী পাঠক দেখুন, গ্রন্থাগারকে ল্যাবোরেটরির সমান গুরুত্বপূর্ণ বলা হচ্ছে) while for humanistic research the library is both library and laboratory in one" এ থেকে অনুধাবন করা যায় যে, উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে গ্রন্থাগার অর্থাৎ একটি ভালো গ্রন্থাগারের গুরুত্ব কতখানি।

একটি গ্রন্থাগারের তিনটি অংশ - গ্রন্থ বা বই বা পত্র-পত্রিকা বা নথি; গ্রন্থাগারিক বা গ্রন্থাগার কর্মী এবং পাঠক বা ব্যবহারকারী। এই তিনটি অংশ যেখানে মিলিত হয় সেটি হল গ্রন্থাগার ভবন। এখন বিগত পঁচাত্তর বছরের ইতিহাসে নেতাজী মহাবিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারের অবস্থানগুলি একবার দেখে নিই। তবে ইতিহাসে ডুব দেওয়ার আগে মনে রাখতে হবে সালটি ১৯৪৮ - ভারতবর্ষ সবে স্বাধীন হয়েছে, স্থান আরামবাগ হুগলী জেলার সর্ব পশ্চিম প্রান্তের এক মহকুমা শহর, কলেজ প্রতিষ্ঠা হয়েছে এলাকার শিক্ষানুরাগী মানুষের প্রচেষ্টায় ও অর্থানুকুল্যে, কোন সরকারী উদ্যোগে নয়। বাধা অনেক, কিন্তু তাকে অতিক্রম করার জেদ ও অধ্যবসায় আরো অনেক বেশি প্রবল। নেতাজী মহাবিদ্যালয়ের গ্রন্থাগার প্রথমে ছিল এখন যেটি বিজ্ঞান ভবন - তার প্রথম তলায়। অবশ্য তখন অন্য কোন তলা ছিল না, কারণ বর্তমানের তিনতলা বাড়ির জায়গায় তখন ছিল খড়ের চাল দেওয়া মাটির একটানা ঘর, মাঝে ছিটেবেড়া দিয়ে আলাদা করা শ্রেণীকক্ষ, শিক্ষকদের বসার জায়গা, ল্যাবোরেটরি এবং আলমারিতে কয়েকটি বই নিয়ে গ্রন্থাগার। এরপর গ্রন্থাগার তার স্থান পরিবর্তন করে আসে এখন যেখানে কলেজের গেস্ট হাউস সেইখানে। কিন্তু এতেও কি গ্রন্থাগারের স্থান সংক্রান্ত সমস্যার সমাধান হয়েছিল? মনে হয় না। কারণ নেতাজী মহাবিদ্যালয় ছাত্র সংসদ প্রকাশিত ১৯৫৯ সালের 'উৎসর্গ' পত্রিকায় তৎকালীন ছাত্র সংসদের সাধারণ সম্পাদক শক্তি দে লিখছেন - "The greatest problem we constantly face lies in the nook of our library. It is in this murky chamber where the reader's genuine urge is smothered. It hardly can provide a standing space, what to speak of sitting down to read! The arrangement of the terrible inadequacy of books

is another enigma. If any amount of attention is paid in connection of moderate collection of books in all of the subjects taught in the college, if reading room facilities are arranged and if everything runs according to the methods of library science, it would have the just claim to be called by its name." পুরোটা হয়তো না দিলেও চলতো কিন্তু দিলাম দুটি কারণে - প্রথম, একজন স্নাতক স্তরের ছাত্রের ভাষা ব্যবহারের সাবলীলতা আর দ্বিতীয় কর্তৃপক্ষের চোখে চোখ রেখে সুশিক্ষিত প্রতিবাদ করার ক্ষমতা।

এরপরে ১৯৭৫-৭৬ সালে গ্রন্থাগার আবার নিজের স্থান পরিবর্তন করে যায় বর্তমান যেটি উদ্ভিদবিদ্যা বিভাগ সেখানে। এখানে বেশ কিছুটা সময় কাটানোর পরে ২০০৩ সালে গ্রন্থাগার আবার স্থানান্তরিত হয়ে যায় বর্তমান বিজ্ঞানভবনের দ্বিতলে। আমি গ্রন্থাগারিক পদে যোগদানের সময় গ্রন্থাগারের অবস্থান ঐ জায়গাতেই ছিল। এরপর স্থায়ী ঠিকানার খোঁজ শুরু হয়। অধ্যক্ষ ড. অসীম কুমার দে, কলেজের পরিচালন সমিতির সদস্যদের প্রচেষ্টায় এবং বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের এবং রাজ্য সরকারের বদান্যতায় প্রশাসনিক ভবনের ঠিক পাশে নির্মিত হয় একটি ত্রিতল বিশিষ্ট কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার ভবন। ২০১৫ সালে গ্রন্থাগার এই ভবনে স্থানান্তরিত হয়। অত্যন্ত দৃষ্টিনন্দন এই ভবন কালিপুর থেকে বালিদেওয়ানগঞ্জ রাস্তার ওপর অবস্থিত হওয়ায় রাস্তা থেকেই এটি দেখতে পাওয়া যায়।

দ্বারকেশ্বর নদের তীরে অবস্থিত হওয়ার জন্য আরামবাগের কালিপুর ও সংলগ্ন বিস্তীর্ণ এলাকাকে বন্যাপ্রবণ বলে গণ্য করা হয়। এজন্য গ্রন্থাগার ভবনের একতলায় কোন গ্রন্থ রাখা হয়নি। দেখে নেওয়া যাক তিনটি তলায় কোথায় কী আছে ঃ-

প্রথম তল ঃ- দুটি ৭০ আসন বিশিষ্ট স্মার্ট ক্লাসরুম এবং সেমিনার হল। ছোট আকারের যে কোন সেমিনার এবং নানা ধরণের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা এই দুটি ঘরে করা হয়। এছাড়াও রয়েছে আর একটি প্রদর্শনী কক্ষ যেখানে কলেজের বিভিন্ন বিভাগ নানান ধরণের মডেল প্রদর্শন করে থাকে।

দ্বিতীয় তল ঃ- এই তলায় আছে ছাত্র-ছাত্রীদের ব্যাগ রাখার জায়গা, ছাত্র-ছাত্রী ও অধ্যাপকদের পাঠকক্ষ, রেফারেন্স বিভাগ, কম্পিউটার সেন্টার ও জেরক্স করার জায়গা। এছাড়া গ্রন্থাগারিকদ্বয়ের ঘরের অবস্থান এই তলাতেই।

তৃতীয় তল ঃ- এই তলায় আছে পুস্তক আদান-প্রদানের ব্যবস্থা এবং প্রধান স্ট্যাক রুম। এছাড়া রয়েছে একটি স্থানিক ইতিহাস সংগ্রহশালা।

২০১৫ সালে এই তিনটি তলা নির্মিত হবার পর ২০২২ সালে চতুর্থতলের কাজ শুরু হয়। এই তলায় সম্প্রতি একটি নাট্যমঞ্চ নির্মিত হয়েছে।

গ্রন্থাগার ভবন নিয়ে আলোচনা করার পরে আসি গ্রন্থাগারের সম্পদ অর্থাৎ গ্রন্থ প্রসঙ্গে। এখানেও চলে আসবে কিছু শিক্ষানুরাগী মানুষের কথা - যাঁদের অকৃপণ দানে সমৃদ্ধ হয়েছে এই গ্রন্থাগার। গ্রন্থাগারে রক্ষিত পুরাতন নথিপত্র থেকে দেখতে পাই ১৯৪৮ সালের পয়লা আগষ্ট তারিখে কলেজ প্রতিষ্ঠা হলেও এর জন্য বই সংগ্রহ করার কাজ শুরু হয়েছিল ১৯৪৮ সালের জানুয়ারি মাস থেকে। আগেই নানা ধরণের বাধার কথা উল্লেখ করেছি। সেইসব বাধাকে অতিক্রম করে কলেজ প্রতিষ্ঠা বা কলেজের গ্রন্থাগারের জন্য পুস্তক সংগ্রহ করা ছিল কঠিন কাজ। কিন্তু আরামবাগ মহকুমা রাজা রামমোহন রায়, রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের জন্মভূমি, শিক্ষা সংস্কৃতির পীঠস্থান, এখানকার মানুষের শিক্ষাপ্রেম, বিদ্যানুরাগের কাছে সব বাধা নতিস্বীকার করেছিল। সেই প্রথম শুরুর পূণ্যলগ্নে যাঁরা গ্রন্থ দান করতে এগিয়ে এসেছিলেন তাঁদের নাম স্মরণ না করলে ইতিহাস আমায় ক্ষমা করবে না।

প্রথম যাঁর দানের বই নিয়ে গ্রন্থাগার পথ চলা শুরু করে তিনি হলেন শ্রীযুক্ত বনমালী আঢ্য মহাশয়। আরামবাগের বিখ্যাত আঢ্য পরিবারের সুসন্তান এই মানুষটি কলকাতা মেডিকেল কলেজের প্রাক্তনী এবং সেই সময়ের বিখ্যাত ব্যাকটেরিওলজিস্ট। কলকাতায় বাস করেও তিনি তাঁর জন্মভূমির সদ্যভূমিষ্ঠ কলেজের গ্রন্থাগারকে সাহায্য করেছিলেন। এরপরে আমরা পাই আঢ্য পরিবারের আর এক সুসন্তান শ্যামল আঢ্যকে। কলকাতার সেন্ট পলস্ কলেজ থেকে পাস করা এই মানুষটি পরবর্তী কালে নিজেকে জড়িয়ে ফেলেন সমাজসেবামূলক কাজের সঙ্গে। তাঁর দান করা গ্রন্থে সমৃদ্ধ হয় আমাদের গ্রন্থাগার। ওকালতি পেশার সঙ্গে যুক্ত অনেক মানুষই এখানে বই দান করেছেন। তখনকার আরামবাগের বিখ্যাত উকিল শ্রী শৈলেশ্বর পাল মহাশয় কলেজ প্রতিষ্ঠার সময় সহায়তা করেছিলেন শুধু নয়, কলেজের গ্রন্থাগারে বই দিয়েও সাহায্য করেছেন। বাতানলের বিখ্যাত উকিল ত্রিলোচন নাথ মহাশয় তিনি কর্মোপলক্ষে আরামবাগে থাকতেন, তিনিও গ্রন্থাগারের উন্নয়নের জন্য পুস্তক দান করেন। আরামবাগ থেকে বহুদূরের বদনগঞ্জের পাশের গ্রাম ফুলুই-এর বাসিন্দা ও জমিদার রামলাল মণ্ডল-এর তৃতীয় পুত্র ফণীন্দ্রনাথ মণ্ডল মহাশয় গ্রন্থাগারের উন্নয়নের জন্য বহু বই দান করেন। এঁদের সঙ্গে কলেজের সম্পর্ক তৈরি হয় স্বর্গীয় ডাঃ রাধাকৃষ্ণ পালের সুযোগ্য সহকর্মী এবং নেতাজী মহাবিদ্যালয়ের পরিচালন সমিতির প্রথম সভাপতি শ্রী হরিশঙ্কর মুখোপাধ্যায়ের মাধ্যমে। এছাড়াও যাঁদের নাম পাওয়া যায়, তাঁরা হলেন যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি (১৮৫১-১৯৬৫)। বাঁকুড়া জেলার এই দিক্‌পাল পণ্ডিত ডি. লিট, আচার্য্য, বিদ্যানিধি, রায়-বাহাদুর ইত্যাদি সম্মানে ভূষিত হন। উনি এই গ্রন্থাগার তৈরির সময় পুস্তক দান করে আমদের চিরকৃতজ্ঞ করেছেন। এঁরা ছাড়াও আরো অনেকের মধ্যে আছেন ড. রাধাগোবিন্দ কর, গৌরী সেনগুপ্ত, কলকাতা নিবাসী লক্ষ্মী নারায়ণ মণ্ডল, স্বর্গীয় অধ্যাপক পীযূষকান্তি পাল, ননীভূষণ দাশগুপ্ত-র মতো গ্রন্থাগার প্রেমী মানুষজন। ব্যক্তি ছাড়াও যে সব সংস্থার গ্রন্থদানে এই গ্রন্থাগার ধন্য হয়েছে,

সেগুলি হল ইউনাইটেড স্টেটস ইনফরমেশন সার্ভিস (USIS) এবং সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজ। এইভাবে সংগৃহীত বই ছাড়াও নবনির্মিত কলেজ নিজের সীমিত সামর্থ্যের মধ্যেও অনেক বই ক্রয় করে। ১৯৬০ সালে কলেজে প্রথম বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের অনুদানে পুস্তক ক্রয় করা হয়। আবার ১৯৬১ সালের মাঝের দিকে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় বহু বই কলেজ লাইব্রেরিকে দান করেন।

গ্রন্থাগারের নথিপত্র থেকে জানা যায়, ১৯৪৮ থেকে ১৯৭৪ সালের ফেব্রুয়ারি মাস পর্যন্ত গ্রন্থাগারে মোট ৪,৮১৯টি বই ছিল। এরপর ১৯৮৪ সালে গ্রন্থাগারে মোট বই-এর সংখ্যা দাঁড়ায় ১১,৮৯০ তে। ১৯৯৬ সালের শেষ ভাগে গ্রন্থাগারে মোট পুস্তক সংখ্যা হয় ২০,৯৪০। এরপর ২০০৩ সালের ৩১শে মার্চ গ্রন্থাগারে মোট বইয়ের সংখ্যা দাঁড়ায় ২৪,৬৭৯। বর্তমানে ২০২৩ সালের মার্চ মাস পর্যন্ত গ্রন্থাগারে মোট বইয়ের সংখ্যা ৫৯,৫৪০। বেশি পরিসংখ্যানের মধ্যে না গিয়েও বলা যায় যে, ১৯৪৮ থেকে ২০০৩ সাল পর্যন্ত ৫৬ বছরে যা বই ছিল পরবর্তী ২০ বছরে বইয়ের সংখ্যা দাঁড়ায় দ্বিগুণেরও বেশি। এরজন্য যাঁর অবদান অনস্বীকার্য তিনি হলেন আমাদের অধ্যক্ষ ড. অসীম কুমার দে মহাশয়। নিয়মিতভাবে প্রতিবছর কলেজের নিজস্ব ফাণ্ড থেকে বই কেনা ছাড়াও ২০১৫ সালের NAAC মূল্যায়ণ পরবর্তীকালে প্রাপ্ত RUSA তহবিলের অর্থ এবং কলেজ পরিচালন সমিতির সভাপতি শ্রী কৃষ্ণচন্দ্র সাঁতরা মহাশয়ের বদান্যতায় বিধায়ক এলাকা উন্নয়ন তহবিল থেকে প্রাপ্ত অর্থে বহু সংখ্যক বই কেনা হয়।

মুদ্রিত বইয়ের পাশাপাশি ইনফ্লিবনেট-এনলিস্টের সদস্য হওয়ার সুবাদে কলেজ বর্তমানে প্রায় ৮,০০০ ইলেকট্রনিক জার্নাল এবং ২,৫০০০০-এর মতো ইলেকট্রনিক বইয়ের ব্যবহার করতে পারে। এর সুবিধা হচ্ছে যে, এগুলিকে যে কোন জায়গায়, যে কোন সময় পড়া যেতে পারে।

ছাত্র-ছাত্রীদের চাকুরি জীবনে প্রবেশ করার পথ সুগম করার জন্য এবং তারা যেন কলেজে পড়াকালীন বিভিন্ন প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার জন্য নিজেদের তৈরি করতে পারে, সেদিকে তাকিয়ে বাংলা ও ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত প্রায় ৩০টি ম্যাগাজিন এবং চাকুরি সংক্রান্ত পত্রিকা গ্রন্থাগারে নেওয়া হয়।

এবার আসি গ্রন্থাগার পরিসেবার বিষয়ে। প্রথমেই বলে রাখা ভাল যে, নেতাজী মহাবিদ্যালয় গ্রন্থাগারের দুটি অংশ। প্রথমটি হল কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার এবং দ্বিতীয়টি হল ২৪টি বিভাগে ছড়িয়ে থাকা বিভাগীয় গ্রন্থাগার। বিভাগীয় গ্রন্থাগারগুলি পরিচালিত হয় বিভাগীয় শিক্ষক-শিক্ষিকাদের দ্বারা। এই প্রবন্ধে মূলতঃ কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে। রেফারেন্স বিভাগে বর্তমানে প্রায় ৯,০০০ বই আছে। এরমধ্যে পাঠ্য বই ছাড়াও আছে তিনটি সংগ্রহ, যথা - বিদ্যানিধি সংগ্রহ (আচার্য যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি কর্তৃক প্রদত্ত পুস্তক সংগ্রহ), ড. কমলকৃষ্ণ ঘোষ সংগ্রহ (কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজনেস ম্যানেজমেন্ট বিভাগের প্রাক্তন অধ্যাপক) এবং ড. অম্বুজ বসু সংগ্রহ (নেতাজী মহাবিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের প্রাক্তন অধ্যাপক এবং জীবনানন্দ

বিশেষজ্ঞ)।

ছাত্র-ছাত্রীদের সুবিধার্থে এখানে রয়েছে ৬টি কম্পিউটার (ইন্টারনেট সংযোগসহ), যেগুলি থেকে তারা বিভিন্ন অনলাইন রিসোর্স ব্যবহার করতে পারে। যেহেতু এই বিভাগ থেকে বই বাড়িতে নিয়ে যাওয়া যায় না, তাই পাঠকদের সুবিধার জন্য রয়েছে জেরক্স মেশিন। এই রেফারেন্স বা পাঠকক্ষ শুধুমাত্র কলেজের বর্তমান ছাত্র-ছাত্রী এবং অধ্যাপক-অধ্যাপিকাদের জন্য নয়, এটি প্রাক্তন ছাত্র-ছাত্রী ও এলাকার জনসাধারণের জন্যও উন্মুক্ত।

গ্রন্থাগারের তৃতীয় তলে রয়েছে বই দেওয়া-নেওয়া করার জায়গা। এসবই হল যে কোনও গ্রন্থাগারের দেওয়ার সাধারণ পরিসেবা। কিন্তু আমাদের নেতাজী মহাবিদ্যালয়ের কিছু নিজস্বতা আছে। যেমন আমরা মনে করি কলেজের দায়িত্ব শুধুমাত্র ছাত্র-ছাত্রীদের শিক্ষা দিয়ে স্নাতক করার মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। তাদের চাকুরি জীবনে এগিয়ে দেওয়াও কর্তব্যের মধ্যে পড়ে। ২০১৬ সাল থেকে কলেজের গ্রন্থাগার থেকে পরিচালিত হওয়া ক্যারিয়ার কাউন্সেলিং সেল এবং টাটা কনসালটেন্সি সার্ভিসের যৌথ উদ্যোগে ১০০ ঘন্টার প্রশিক্ষণ শেষ করে আজ পর্যন্ত তিন শতাধিক ছাত্র-ছাত্রী সাফল্যের সঙ্গে টাটা কনসালটেন্সি সার্ভিসের মত বহুজাতিক সংস্থায় কর্মরত।

নেতাজী মহাবিদ্যালয় সমাজের প্রতি একটি কর্তব্য পালন করে চলেছে নিঃশব্দে; বলতে পারা যায় লোকচক্ষুর আড়ালে। যে কোন সংস্থার দায়িত্ব বা সামাজিক কর্তব্য হল সেই জায়গার ইতিহাস, ঐতিহাসিক স্মারক এবং ঐতিহ্যকে রক্ষা করার বা কালের স্রোতে বিস্মৃত হওয়ার আগে তাকে সংরক্ষণ করার, যাতে ভাবী প্রজন্ম নিজের অতীত সম্পর্কে জানতে পারে। এই দৃষ্টিকোণ থেকে ২০১৫ সালে কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার ভবনের ত্রিতলে গড়ে ওঠে এক স্থানীক ইতিহাস সংগ্রহশালা। ছাত্র-ছাত্রীদের মাধ্যমে সংগ্রহ করা হয় বহু পুরাতন মুদ্রা, হাতে লেখা পুঁথি ইত্যাদি সংগ্রহযোগ্য এবং সংরক্ষণযোগ্য ঐতিহাসিক উপাদান।

এরপরে চলে আসি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অংশ অর্থাৎ গ্রন্থাগার ব্যবহার এবং ব্যবহারকারী প্রসঙ্গে। যে কোন গ্রন্থাগার সার্থকতা খুঁজে পায় তার প্রকৃত ব্যবহারের মধ্যে, যা নির্ভর করে বেশ কিছু বিষয়ের উপর, যেগুলি হয়তো গ্রন্থাগার নিয়ন্ত্রণ করতে পারে না বা পারে কিন্তু নানা কারণে করা যায় না। ছাত্র-ছাত্রী সংখ্যার নিরিখে প্রায় ৫০০০। অর্থাৎ বেশ বড়ো কলেজ। কিন্তু গ্রন্থাগারে আসে খুব বেশি হলে গড়ে ১০০ জন। কিন্তু কেনো? এত কম সংখ্যার কারণ কী? এর কারণ বিশ্লেষণ করতে গিয়ে আমি ব্যক্তিগতভাবে যেগুলি চিহ্নিত করতে পেরেছি, সেগুলি হল –

❍ **শিক্ষা ব্যবস্থার মানের সামগ্রিক অবনমন ঃ-** উচ্চমাধ্যমিক পাস করে আসা ছাত্র-ছাত্রীদের সরকারি নিয়মে কলেজে পড়ার সুযোগ করে দিতে গিয়ে অর্থাৎ উচ্চশিক্ষা প্রাঙ্গনে বেশি সংখ্যক ছাত্র-ছাত্রীকে নিয়ে

আসতে গিয়ে আমরা আপোষ করছি ছাত্র-ছাত্রীদের গুণগত মানের সঙ্গে। উল্লেখ্য, দ্বাদশ শ্রেণী (H.S.) পাশের পরে যখন দেখা যায় কলেজে পড়তে আসা ছাত্র-ছাত্রীদের একটা বড় অংশ একটি আবেদনপত্র সঠিক ভাবে লিখতে পারে না- বানানের কথা তো ছেড়েই দিলাম। তখন ঐ শিক্ষার মান নিয়ে প্রশ্ন ওঠে। কলেজে বহু ছাত্র-ছাত্রী তাদের বিভাগের সমস্ত শিক্ষক-শিক্ষিকার নাম বলতে পারবে না কিন্তু বলতে পারবে নানান বৃত্তি, স্কলারশিপ বা সবরকম আর্থিক ছাড়ের কথা। কলেজে যদি জনঘনত্ব বিচার করতে হয়, তবে স্কলারশিপ বিভাগ সবচেয়ে প্রথমে থাকবে। খুব স্বাভাবিক ভাবেই এই জনসংখ্যার খুব স্বল্প অংশই গ্রন্থাগারমুখী হবে।

❍ **আমরা যেমন দেখি তেমন শিখি ঃ-** প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা এবং লাইব্রেরির নথিপত্র থেকে বলা যায় যে-সব বিভাগের শিক্ষক-শিক্ষিকারা নিয়মিতভাবে গ্রন্থাগারে আসেন এবং গ্রন্থাগার ব্যবহার করেন সেইসব বিভাগের ছাত্র-ছাত্রীদের গ্রন্থাগারমুখী হওয়ার প্রবণতা বেশি থাকে।

❍ **বৈদ্যুতিন মাধ্যমের ব্যাপক প্রসার ঃ-** এখন অধিকাংশ ছাত্র-ছাত্রীর হাতে মুঠোফোন থাকায় তারা বুঁদ হয়ে থাকে মোবাইলের জগতে। যদিও ইন্টারনেটে বেশকিছু শিক্ষণীয় জিনিস পাওয়া যায়, কিন্তু মনে হয় না যে সেগুলি তারা পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে দেখে। কারণ অধিকাংশ ছাত্র-ছাত্রীদের বাস্তব ও গুণগতমান অন্য কথা বলে।

❍ **টিউশন ও অত্যাধিক নোট নির্ভরতা ঃ-** কলেজে ঢুকে বা তার আগে থেকেই একজন ছাত্র ঠিক করে ফেলে যে কারা কারা পড়ান এবং ভালো নোট দেন যা পরীক্ষার খাতায় লিখে এলে পাস করা বা ভালো নম্বর পাওয়া কোন ব্যাপার নয়। এখন যদি সহজে নোট মুখস্থ করে উদ্ধার হওয়া যায়, তাহলে কোন্ মুর্খ আর লাইব্রেরিতে বসে নিজে খেটে, বই ঘেঁটে নোট তৈরি করে। উল্লেখ্য, এই ব্যবস্থা স্বল্প হলেও কয়েক বছর আগে ছিল, কিন্তু এখন আর তাও চোখে পড়ে না।

❍ **করোনা ঃ-** সাম্প্রতিককালে করোনা নামের মহামারীর সূত্র ধরে পৃথিবী স্তব্ধ হয়ে গেছে দুই বছরের বেশি সময় ধরে। কলেজ বন্ধ। লাইব্রেরি বন্ধ। আমরা অভ্যস্ত হয়ে গেছিলাম অনলাইন মাধ্যমে পঠন-পাঠনের ওপর। বাড়িতে বসে পরীক্ষা দেওয়া ও পাস করার ব্যবস্থাও আনতে হয়েছে বাধ্য হয়ে। আমরা বলতে পেরেছি করোনা কালেও স্বাভাবিক পঠন-পাঠন চলেছে, শুধু মাধ্যম পরিবর্তিত হয়েছে। আনন্দের কথা। কিন্তু এর কুফল দেখা গেছে করোনা পরবর্তীকালে। কলেজে আসার ব্যাপারে একটা সামগ্রিক অনীহা, আরো বেশি টিউশন নির্ভরতা - এসব গ্রাস করেছে আমাদের। এরজন্য সবচেয়ে বেশি গুরুত্বহীন হয়েছে লাইব্রেরি। ছাত্র-ছাত্রী আসার সংখ্যা কমেছে বহুগুণ। এই ক্ষতি গ্রন্থাগারের না সমগ্র সমাজের এই প্রশ্ন আমি পাঠকের কাছে রাখলাম।

গ্রন্থাগার ভবন এবং গ্রন্থাগারের বই ও তার ব্যবহার প্রসঙ্গে আলোচনা শেষ করে এবার আসি কলেজের সঙ্গে যুক্ত সমস্ত স্তরের মানুষের প্রসঙ্গে। কলেজ, কলেজের অন্তর্জন, গ্রন্থাগারের কর্মী, সহকর্মী এঁদের কথা না বললে লেখা অসমাপ্ত থেকে যাবে। কলেজে যোগ দিয়ে যাঁকে অধ্যক্ষ হিসাবে পেয়েছি তিনি হলেন

আরামবাগের ভূমিপুত্র ড. অসীম কুমার দে। বাণিজ্যের ছাত্র, ম্যানেজমেন্টের ডক্টরেট এই মানুষটিকে কাজের সূত্রে দেখেছি বেশ কাছ থেকেই। যে কোন পরিস্থিতিকে মাথা ঠাণ্ডা রেখে সামাল দেবার সহজাত ক্ষমতার অধিকারী তিনি। কলেজের এই বর্তমান রূপের নেপথ্য কারিগর। কোন কাজই যেমন একা করা যায় না, তেমনই কলেজের সামগ্রিক গুণগত ও পরিকাঠামোগত উন্নয়নও একা করা যায় না। প্রয়োজন হয় একটা টিমের। অধিনায়কের কৃতিত্ব সেখানেই যেখানে তিনি এই টিমের সদস্যদের সঠিকভাবে বেছে নেন এবং তাদের দিয়ে কাজটি করিয়ে নেন। এখানেই তাঁর সাফল্য।

গ্রন্থাগার সংক্রান্ত বিষয়ে বেশকিছু উন্নয়ন এনার সময়ে হয়েছে। যেমন - কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার ভবন, ব্যাপক সংখ্যায় পুস্তক বৃদ্ধি, গ্রন্থাগারের অটোমেশন ইত্যাদি। অধ্যক্ষের পরই যাঁর নাম করতে হয়, তিনি হলেন ড. বিশ্বনাথ গড়াই - আমাদের কলেজের মাননীয় উপাধ্যক্ষ। কর্তব্যে নিরলস এই মানুষটির কলেজের প্রতি ভালোবাসা ও দায়িত্ববোধ অনুকরণযোগ্য। উপাধ্যক্ষপদের প্রশাসনিক দায়িত্ব, বারসারের দায়িত্ব, পরীক্ষা সংক্রান্ত দায়িত্ব এবং অন্যান্য দায়িত্ব শ্রদ্ধেয় বিশ্বনাথদা হাসিমুখেই সামলান।

ইংরাজীতে একটা কথা আছে শুনেছি - "Last but not the least" এবার যাঁর কথা বলব তিনি হলেন কলেজের পরিচালন সমিতির সভাপতি শ্রী কৃষ্ণচন্দ্র সাঁতরা মহাশয়। কলেজের তথা গ্রন্থাগারের উন্নয়নের জন্য যখনই ওনার কাছে যাওয়া হয়েছে তখনই এই শিক্ষানুরাগী মানুষটি আমাদের জন্য তৎপর হয়ে উঠেছেন। এনারা ছাড়াও গ্রন্থাগারের উন্নয়নে সাহায্য করার জন্য আমাদের কলেজ পরিচালন সমিতির বাকি সদস্যদের প্রতিও আমি কৃতজ্ঞ। কারণ তাঁরা বই কেনার সময় অত্যন্ত বিচার বিবেচনার মাধ্যমে বই কেনেন এবং গ্রন্থাগারকে সমৃদ্ধ করেন।

প্রথমদিন অধ্যক্ষ ড. অসীম কুমার দে আমার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেন লাইব্রেরির তৎকালীন করণিক প্রয়াত শ্রীযুক্ত শিশির কুমার কুণ্ডুর সঙ্গে। শিশিরদার সঙ্গে লাইব্রেরিতে এসে পরিচয় হল শ্রী শুকদেব মণ্ডল, শ্রী দেবব্রত সরকার এবং শ্রী দেবীপ্রসাদ ঘোষের সঙ্গে। সেই সময় লাইব্রেরী ছিল বর্তমান পরিবেশ বিদ্যা বিভাগের উপরে দ্বিতলে একটি হলঘরে। জায়গার বেশ ভালো রকম সমস্যা ছিল। সহকর্মীদের মধ্যে শিশিরবাবুর সঙ্গে দাদা-ভাই সম্পর্ক বজায় ছিল ওঁনার জীবনের শেষদিন পর্যন্ত। লাইব্রেরি অন্তঃপ্রাণ এই মানুষটিকে আমি যে কদিন পেয়েছি কোনদিন দেরি করে আসতে দেখিনি। নানান ধরণের কাজ সামাল দিতেন অনায়াস দক্ষতায়। কাজের বাইরে ছিল মাছ ধরার নেশা। একটা সময় প্রতি রবিবার ওনার সঙ্গে মাছ ধরতে যাওয়া একরকম অভ্যাসে পরিণত হয়েছিল। তারপর একদিন হঠাৎই শুনলাম যে উনি মারা গেছেন। এরপর বলতে হয় শুকদেবদার কথা। প্রথমদিন গিয়ে দেখেছিলাম কম্পিউটারের সামনে বসে একমনে ডাটা এন্ট্রি করে চলেছেন। এখন উনি অফিসে চলে এসেছেন কিন্তু একই রকম ধীর-স্থির এবং ছাত্রদরদী। দেবুদার ছিল লাইব্রেরিতে

কোথায় কোন বই আছে সে সম্পর্কে জ্ঞান। দেবীদা, নিজের কাজ নিয়ে অত্যন্ত সচেতন এই মানুষটির ছিল চায়ের নেশা। বোটানি বিভাগের বারান্দায় উপেনদার চায়ের দোকানে যেতেন নিজের স্টীলের গ্লাস নিয়ে। আস্তে আস্তে দেবীদা, দেবুদা অবসর নিলেন। ২০১৪ সালে গ্রন্থাগারিক পদে যোগ দিলেন শ্রী সঞ্জয় কারক। বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এম এল আই এস পাস করা এই সদাহাস্যময় যুবককে গ্রন্থাগারিক ও সহকর্মী হিসাবে আমি পেয়েছি। গ্রন্থাগারের আধুনিকতম প্রযুক্তিগত উন্নয়নের কাজকে উনি গতি দিয়েছেন। কেউ কোনো সমস্যা নিয়ে সঞ্জয়ের কাছে গেলে উনি সেই সমস্যার সমাধান করার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, কলেজের দ্বারা প্রকাশিত বিভিন্ন বইয়ের ISBN সংক্রান্ত কাজ সঞ্জয়বাবু অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গেই করে থাকেন। গ্রন্থাগারের বারকোডিং এবং ওপ্যাক হয়তো ওনাকে ছাড়া সম্ভব হত না। কামারপুকুরের সন্নিকটে আনুড়ের বি. এড. কলেজ বন্ধ হয়ে যাওয়ায় সেখান থেকে এলেন চন্দ্রনাথ বাবু। এমন একজন পণ্ডিত মানুষের জন্য লাইব্রেরিটাই আদর্শ জায়গা হতে পারে। উনিও লাইব্রেরিকে ভালোবেসে রয়ে গেলেন এখানেই অবসর গ্রহণের দিন পর্যন্ত। লাইব্রেরিতে কাজ করতে এসেছেন রাজুদা। এতটাই আন্তরিক ছিল আমাদের সম্পর্ক যে, অনেকদিন পর্যন্ত জানতাম না যে, ওনার ভালো নাম দীপঙ্কর বাড়ুই। এসেছে সুচিন্ত্য কৃষ্ণ। কৃষ্ণের হাত ধরে তৈরি হয়েছে অনেক সুন্দর শিল্পকর্ম এবং সেগুলি রক্ষিত হয়েছে লাইব্রেরিতে। এখন লাইব্রেরিতে রয়েছেন আশিস মালিক ও স্বান্তনাদি।

পরিশেষে এই কলেজের এবং গ্রন্থাগারের সর্বাঙ্গীন মঙ্গল ও শ্রীবৃদ্ধি কামনা করি। গ্রন্থাগার, ছাত্র-ছাত্রী ও সমাজের উন্নতিতে এই মহাবিদ্যালয় ভবিষ্যতেও সর্বাত্মক ভূমিকা পালন করবে এই আশা রাখি।

আমার স্বপ্নের কলেজ

ড. ধীমান কর

মনে পড়ে যায় ২০১৭ সালের ২রা জানুয়ারির কথা, যেদিন আমি নেতাজী মহাবিদ্যালয়ে আমার নতুন জীবন শুরু করি। শুরু হয় আমার ক্ষুদ্র জীবনের এক নতুন অধ্যায়-নতুন পরিস্থিতি-নতুন সব মানুষ। কিন্তু আমার একবারের জন্যও মনে হয়নি আমি নতুন জায়গায় এসেছি। সবাই খুব সহজেই অতি সযত্নে আপন করে নিয়েছিলেন।

আমি আগেই জানতাম আরামবাগে কালিপুর কলেজ নামে একটা কলেজ আছে। জানতাম না এর নাম নেতাজী মহাবিদ্যালয়। কলেজ সার্ভিস কমিশনের দেওয়া কলেজ তালিকা দেখে আমার স্যার ড. ভীমচন্দ্র মণ্ডল বললেন - "খুব ভালো কলেজ, তাই এই কলেজে চাকরি করতে বেশ ভালো লাগবে।" স্যারের মুখে শোনার পর থেকেই এই কলেজ সম্পর্কে আমার আবেগ আর কৌতূহল বাড়তে থাকে, আর তার সাথে চিন্তা - সুযোগ পাবো তো এই কলেজে আসার? কলেজ সার্ভিস কমিশনের কাউন্সেলিং থেকে পেতে হবে এই কলেজ। আমার আগে যদি কেউ নিয়ে নেয়! সেই চিন্তা। আবেগের আরো একটি কারণ হল - আমার স্কুলের নাম 'কমলপুর নেতাজী হাই স্কুল'। যে স্কুলে আমি আমার স্কুল জীবন অতিবাহিত করেছি, সেই স্কুল আজ আমাকে পৌঁছে দিতে চলেছে নেতাজীর নামে নামাঙ্কিত এই কলেজে - আমার স্বপ্নের ঠিকানায়। যাইহোক, যথারীতি কাউন্সেলিং-এ গিয়ে পেয়েও গেলাম আমার স্বপ্নের ঠিকানা নেতাজী মহাবিদ্যালয়ে সেবা দানের সুযোগ।

কমিশনের সুপারিশ পত্রের জন্য অপেক্ষা করতে থাকি, কবে পাবো সেই চাবিকাঠি যা দিয়ে আমার স্বপ্নের জায়গায় পৌঁছাতে পারবো। সুপারিশ পত্র পাওয়ার আগেই ভাবলাম, একদিন কলেজ দেখে এলে কেমন হয়! বাবাকে বললাম। বাবাও রাজি হলেন। বাবা, মা ও আমি একদিন বেরিয়ে পড়লাম সকালবেলা। পৌঁছলাম সঠিক ঠিকানায়, নেতাজী মহাবিদ্যালয়ে। আমি তো দেখি শুধু দেখি। এখানে আমি চাকরি করবো !!! এত্তো বড় কলেজ!!! এর আগে আমি কখনো ভাবিনি, কোনো কলেজ এতো বড়ে হতে পারে! আকারে-আয়তনে সুবৃহৎ, প্রাকৃতিক শোভায় সজ্জিত এক শিক্ষাঙ্গন। আমি ভাবছি তখন, পারবো তো এত বড় কলেজে পড়াতে! কত কত ছাত্র-ছাত্রী, কত কত অধ্যাপক-অধ্যাপিকা।

যাইহোক, কলেজের প্রবেশদ্বারে গেলাম, কলেজের দ্বাররক্ষীর কাছে অনুমতি নিয়ে প্রবেশ করলাম

* অধ্যাপক, শিক্ষা বিভাগ

আর আমার গায়ে রীতিমতো কাঁটা দিচ্ছে। পৌঁছলাম কলেজের অধ্যক্ষ মহাশয়ের ঘরে। তিনি আমাদের সাদরে স্বাগত জানালেন। আমি প্রণাম করতে গেলাম, কিন্তু উনি বুকে টেনে নিলেন। মনে হল যেন কত দিনের আত্মীয়তা। প্রথম সাক্ষাতেই তিনি আপন করে নিলেন। তারপর জিজ্ঞাসা করলেন, সুপারিশ পত্র পেয়েছি কি না। জানালাম, এখনো পাইনি। তিনি বললেন, সুপারিশ পত্র পেলেই যেন আমি কলেজে যোগাযোগ করি। আমি ভাবছিলাম, যে কলেজের অভিভাবক এতো আন্তরিক, সেই কলেজের বাকি সদস্যরা যে খুবই আন্তরিক হবেন সে বিষয়ে কোনো অনিশ্চয়তা নেই। তারপর তিনি চা খাওয়ালেন এবং আরো বিভিন্ন কথা হল। সেখান থেকে বেরিয়ে আরো একটু ঘুরে ঘুরে দেখলাম আমার স্বপ্নের জায়গাটাকে। তারপর বাড়ি ফিরলাম আর অপেক্ষা করতে থাকলাম কমিশনের সুপারিশ পত্রের।

অবশেষে প্রতীক্ষার অবসান ঘটিয়ে বাড়িতে এলো সুপারিশ পত্র, আর তার পরদিন ২৬শে ডিসেম্বর, ২০১৬ কলেজ থেকে আমাকে ফোন করে জানানো হল, আমি যেন ২রা জানুয়ারি, ২০১৭ তারিখে কলেজে গিয়ে কাজে যোগদান করি। আমি জিজ্ঞেস করলাম, তার আগে যোগ দেওয়া যাবে না? কারণ আমি তো আর অপেক্ষা করতেই পারছিলাম না। জানানা হল, ২রা জানুয়ারির আগে কলেজ বন্ধ থাকবে। তাই ওইদিন থেকে আমি যোগদান করতে পারবো। এল সেই দিন, আমি কলেজে অধ্যক্ষ মহাশয়ের ঘরে গিয়ে শিক্ষকতা কর্মে যোগ দিলাম।

এখনো পর্যন্ত দীর্ঘ ছয় বছর কাজ করলাম এই কলেজে। যোগ দেওয়ার পর সবার সাথে পরিচয় হল। সবার মধ্যে কত সুমধুর সম্পর্ক যা দেখে আমি অভিভূত হয়েছিলাম। কর্মক্ষেত্রেও যে এমন মধুর সম্পর্ক গড়ে ওঠে সেটা আমি এখানে না এলে বুঝতেই পারতাম না। আমি বয়সে অনেক ছোট তখন সবার থেকে। সবাই আমাকে ভ্রাতৃস্নেহে গ্রহণ করলেন। আমার পিতৃ-মাতৃতুল্য অধ্যাপক-অধ্যাপিকা মহাশয়-মহাশয়াগণ আমাকে সন্তান স্নেহে গ্রহণ করলেন। পূর্বে শুনেলিাম, কর্মক্ষেত্রে নতুন যোগ দিলে নাকি পূর্বসুরিরা বিভিন্নভাবে উত্তরসূরীদের অবজ্ঞা করেন, বেশি পাত্তা দেন না। কিন্তু এখানে এসে দেখলাম ঠিক তার বিপরীত পরিস্থিতি। সবাই কত সহজে আপন করে নিলেন আমাকে। এই ছয় বছরে কলেজে বা কলেজের বাইরে যখনই সমস্যার সম্মুখীন হয়েছি, আমার সহকর্মীরা এগিয়ে এসেছেন, ভ্রাতৃস্নেহে আমাকে সাহায্য করেছেন। কলেজের অফিসে যখনই কোনে কাজের জন্য গেছি, তৎক্ষণাৎ সাহায্য পেয়েছি আমার শিক্ষাকর্মী দাদা-দিদিদের কাছ থেকে। অধ্যক্ষ মহাশয়, অধ্যাপক-অধ্যাপিকা, শিক্ষাকর্মীবৃন্দ সবাই মিলে একজোট হয়ে এই মহান প্রতিষ্ঠানকে এগিয়ে নিয়ে চলেছেন নিরন্তর ভাবে। আমিও সেই দলে যোগ দিতে পেরে নিজেকে ধন্য মনে করি।

এই কলেজ নেতাজীর নামে ভূষিত হয়ে জন্মগ্রহণ করে ১৯৪৮ সালের ১লা আগষ্ট। এখন ২০২৩ সাল। ১৯৪৮ সালের ১লা আগষ্ট যে চারাগাছ বপন করেছিলেন মাননীয় ডাঃ রাধাকৃষ্ণ পাল মহাশয় ও তাঁর

অনুগামীরা, আজ সে পঁচাত্তর বছরের প্রবীণ মহীরূহে পরিণত হয়েছে। এই পঁচাত্তর বছরে বহু ঘাত-প্রতিঘাত সহ্য করে এখনো সে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে আর হাজার হাজার ছাত্র-ছাত্রীকে এখনো ছায়া দান করেই চলেছে।

প্রাথমিকভাবে ছোট্ট কুঁড়ে ঘর-টিনের চাল, কয়েকজন অধ্যাপক মহাশয় আর কিছু সংখ্যক শিক্ষার্থী নিয়ে মহাবিদ্যালয়ের পঠন-পাঠন শুরু হলেও এখন হাজার হাজার শিক্ষার্থী, একশোর ওপর অধ্যাপক-অধ্যাপিকা, শিক্ষাকর্মী নিয়ে বিশাল আকার ধারণ করেছে নেতাজী মহাবিদ্যালয়। বর্তমানে বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিভুক্ত একটি স্বনামধন্য কলেজ হল এই নেতাজী মহাবিদ্যালয়।

প্রথমে কয়েকটি বিষয়ে পঠন-পাঠন শুরু হলেও বর্তমানে ২১টি বিভাগে অনার্সসহ মোট ২৪টি বিষয়ে পড়াশোনা হয় এখানে। বর্তমানে শিক্ষার্থীর সংখ্যা প্রায় পাঁচ হাজার। শুধুমাত্র হুগলী জেলা নয়, তার বাইরেও বাঁকুড়া, পুরুলিয়া, মেদিনীপুর, বর্ধমান জেলা থেকে আসা বহু শিক্ষার্থীর ভবিষ্যৎ রচনা করে নেতাজী মহাবিদ্যালয়। আমি ক্লাসে গিয়ে জানতে পারি তাদের মধ্যে কিছু জনের বাড়ি পুরুলিয়া জেলার প্রত্যন্ত অঞ্চলে। এদের মধ্যে বেশীরভাগ আদিবাসী সাঁওতাল সম্প্রদায়ের। এত দূর থেকে কেন এখানে পড়তে এল সে বিষয়ে আমার কৌতূহল হল। তাদের কাছেই জানতে চাইলাম, কেন তারা এত দূর থেকে এখানে পড়তে এল। তারা জানাল, স্যার, এই কলেজে সাঁওতালি বিভাগ খুব ভালো। আর তাছাড়া এখানে হোস্টেলে থাকার অনেক ভালো সুবিধা আছে। পরে খোঁজ নিয়ে জানতে পারি আমাদের কলেজের ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য যে হোস্টেলগুলো আছে সেখানে SC, ST শিক্ষার্থীদের বিশেষকরে ছাত্রীদের হোস্টেলে তাদের প্রোটিন জাতীয় খাবার হিসেবে মাছ, মাংস ও ডিমের খরচ কলেজ বহন করে। সেদিক দিয়ে বলা যায়, আমাদের মহাবিদ্যালয় পিছিয়ে পড়া সম্প্রদায়ের শিক্ষার্থীদের জন্যও বিশেষ ব্যবস্থা করে রেখেছে, যাতে তারা উচ্চশিক্ষা লাভ করতে পারে।

পরিকাঠামোগত দিক দিয়ে সত্যি সুসজ্জিত এক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। প্রায় ১০০র ওপর ক্লাসরুম, উন্নতমানের পরীক্ষাগার, ২টি স্মার্ট ক্লাসরুম, ৯টি ভার্চুয়াল ক্লাসরুম, অডিটোরিয়াম, নতুন গঠিত নাট্যমঞ্চ, চারটি (দুটি ছাত্রদের ও দুটি ছাত্রীদের জন্য) বড় মাপের শিক্ষার্থী হোস্টেল নিয়ে পড়াশোনার জন্য এক আদর্শ ও সার্থক প্রতিষ্ঠান হিসেবে পরিগণিত হয় আমাদের সাধের মহাবিদ্যালয়। আরামবাগ ও পাশ্ববর্তী অঞ্চলের মহানুভব মানুষের জমি দানের কল্যাণে কলেজের জমির পরিধিও সুবিশাল।

শুধুমাত্র পরিকাঠামো নয়, এই পরিকাঠামোকে যথাযথভাবে ব্যবহার করে এখানকার শিক্ষক-শিক্ষার্থীরা। প্রায় সব বছরেই বিশ্ববিদ্যালয়ের ফাইনাল পরীক্ষায় গোল্ড মেডেল পেয়ে থাকে আমাদের কলেজের কোনো না কোনো শিক্ষার্থী। তাই সেদিক দিয়েও সার্থক আমাদের নেতাজী মহাবিদ্যালয়।

হুগলী জেলা মুলত কৃষি ও শিল্প প্রধান জেলা। এখানকার বেশিরভাগ চাষযোগ্য জমি তিন ফসলী

জমি। আমাদের ছাত্র-ছাত্রীদের জিজ্ঞেস করে জানতে পারি, তাদের প্রায় প্রত্যেকেরই কিছু না কিছু চাষের জমি আছেই। মাঝে মাঝে লক্ষ্য করি কিছু কিছু শিক্ষার্থী কলেজে ঠিকমতো উপস্থিত হতে পারছে না। একদিন একটি ছাত্রীকে আমি জিজ্ঞেস করলাম, ঠিকমতো কলেজে না আসার কারণ কী? সেই ছাত্রীটি যা বলল, তাতে আমার নির্বাক হয়ে বসে থাকা ছাড়া আর কোনো উপায় ছিল না। সে জানালো যে, বাড়িতে তারা তিন বোন, সাথে থাকেন বৃদ্ধা ঠাকুমা। সেই ছাত্রীটি খুব ভোরে ঘুম থেকে উঠে মাঠে যায় চাষের কাজের জন্য, মাঠের কাজ সেরে বাড়িতে এসে রান্না করে সবার জন্য, তারপর খেয়ে রেডি হয়ে কলেজে আসে। প্রতিদিন তার পক্ষে এত পরিশ্রম সম্ভব হয় না, তাই মাঝে মাঝে সে কলেজে আসতে পারে না। মাঠের কাজ থেকে উপার্জিত অর্থ দিয়ে সে সংসারের খরচ ও কলেজ যাওয়া-আসার খরচ বহন করে। এরকম বহু শিক্ষার্থী আছে, যারা চাষের কাজে পরিবারকে সাহায্য করে মাঠে গিয়ে কাজে হাত লাগিয়ে। কোনো শিক্ষার্থী কলেজে না এলেই আমি না আসার কারণ জিজ্ঞেস করি। তাদের মধ্যে বেশিরভাগ জনই আমাকে জানায়, স্যার, আলু লাগানোর কাজ বা আলু তোলার কাজ বা ধান লাগানো বা ধান বাড়িতে তোলার কাজ চলছিল। চাষের কাজে পরিশ্রম করার পরেও প্রায় সব বছরেই বিশ্ববিদ্যালয়ের অনার্সের ফাইনাল পরীক্ষায় গোল্ড মেডেল পেয়ে থাকে আমাদের কলেজের কোনো না কোনো বিভাগের শিক্ষার্থী, যা আমাকে প্রতি মুহূর্তে অনুপ্রেরণা দেয়।

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সব থেকে পবিত্র সম্পর্ক ছাত্র-শিক্ষক সম্পর্ক। কিন্তু কালের অমোঘ পরিহাসে দিনে দিনে এই সম্পর্ক তলানিতে ঠেকেছে। দিনে দিনে মূল্যবোধের অবক্ষয় আমাদের চোখে পড়ার মতো। বর্তমানে যেখানে দিকে দিকে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ছাত্র অসন্তোষ, ছাত্র আন্দোলন, ছাত্রদের দ্বারা শিক্ষক নিগ্রহের খবর চোখে পড়ে, সেখানে আমাদের কলেজে এর উল্টো প্রতিচ্ছবি আমার দেখতে পাই। আমাদের কলেজে কোনো ছাত্র আন্দোলন বা শিক্ষক নিগ্রহের ঘটনার কোনো উদাহরণ নেই। কলেজে যে কোনো অনুষ্ঠান আয়োজন ও পরিচালনায় আমাদের কলেজের ছাত্র-ছাত্রীরা কলেজের শিক্ষক মহাশয়দের সাথে একজোট হয়ে অদম্য পরিশ্রম করে অনুষ্ঠানকে সাফল্যমণ্ডিত করে তোলে। আমাদের মহাবিদ্যালয়ে ছাত্র-ছাত্রী-শিক্ষক সম্পর্ক এখনও অনন্য নজির গড়ে।

আমাদের শিক্ষার্থীরা শুধুমাত্র পড়াশোনা বা আচার ব্যবহারেই নয়, সহপাঠক্রমিক কার্যাবলীতেও যথেষ্ট প্রতিভার অধিকারী। প্রতি বছর কলেজে সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়। যেখানে আমাদের প্রচুর শিক্ষার্থী আগ্রহের সঙ্গে অংশগ্রহণ করে নিজেদের প্রতিভা প্রদর্শন করে। আবৃত্তি, অঙ্কন, সঙ্গীত, নৃত্য, সাহিত্য রচনা, শ্রুতি নাটক, বক্তৃতা, বিতর্ক প্রভৃতি নানা প্রতিযোগিতায় বহু ছাত্র-ছাত্রী অংশগ্রহণ করে এবং সেখান থেকে তাদের প্রতিভা যাচাই করে, যাতে তারা ভবিষ্যতে তাদের প্রতিভার আরো বিকাশ সাধন করতে পারে তারজন্য আমাদের কলেজের অধ্যাপক-অধ্যাপিকাবৃন্দ শিক্ষার্থীদের অনুপ্রাণিত করেন।

শিক্ষার্থীদের প্রতিভা কেমনভাবে সুপ্ত অবস্থায় থাকে, তার একটা উদাহরণ দিই। ২০২২ সালের Youth Parliament Competition-এ আমাদের কলেজ থেকে অংশগ্রহণ করা হবে, তারজন্য মহড়া চলছে। সেখানে প্রায় সবাই ছাত্রী। একটি ছাত্র এসে বলল, সেও অংশ নিতে চায়। ছাত্রটিকে ক্লাসেও ঠিকমতো দেখা যায় না বলে খবর পেলাম। তাকে বাহ্যিকভাবে দেখে ভাবলাম এ তো পারবে না ঠিকমতো। তাছাড়া যেখানে সব অংশগ্রহণকারী ছাত্রী, সেখানে একটিমাত্র ছাত্রকে নেওয়া যায় কীভাবে। আমরা যারা দায়িত্বে ছিলাম পড়লাম বিড়ম্বনায়। তাকে বাদ দিতেও পারছি না, আবার নিতেও পারছি না। কি করা যায় এই ভাবতে ভাবতে আমরা আলোচনা করলাম যে, ও যখন অংশ নিতেই চায় তাহলে সংবিধান সংক্রান্ত ক্যুইজ প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করুক। আগের থেকে একটি মাত্র ছাত্র ছিল ক্যুইজ প্রতিযোগিতায় যাওয়ার জন্য, তার সাথে যোগ করলাম এই ছাত্রটিকে। আমরা ভেবেই নিয়েছিলাম যে, ওরা পারবে না বিজয়ী হতে। কিন্তু আমাদের ধারণাকে ভুল প্রমাণ করে তারা আন্ত-কলেজ প্রতিযোগিতায় প্রথম স্থান তো অধিকার করলই, তারপর ডিভিশনেও বিজয়ী হয়ে রাজ্যস্তরে প্রতিযোগিতায় যেতে পেরেছে। আমরা রীতিমতো অবাক হয়েছিলাম সেবার। এরকম ভাবে বিভিন্ন মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের প্রতিভা বিকশিত হতে পারে, যদি তাদের সঠিকভাবে সুযোগ দেওয়া হয় এবং তাদের প্রতিভার সঠিক পরিচর্যা করা হয় - যা আমাদের কলেজ করে থাকে। পড়াশোনা করে চাকরি করাই যে শিক্ষার মূল লক্ষ্য নয়, নিজের প্রতিভাকে পুরোপুরি ভাবে বিকশিত করেও যে জীবনে প্রতিষ্ঠিত হওয়া যায়, তার বাস্তবিক প্রয়োগ দেখা যায় আমাদের মহাবিদ্যালয়ে।

পড়াশোনা, অন্যান্য সৃজনমূলক প্রতিভার চর্চার পাশাপাশি খেলাধূলা ও যোগ অভ্যাসেও আমাদের ছাত্র-ছাত্রীরা কম প্রতিভার নয়। কলেজের ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় দেখা যায় প্রচুর ছাত্র-ছাত্রীর স্বতস্ফূর্ত অংশগ্রহণ এবং সেখানে তাদের প্রতিভার বিচ্ছুরণ। আমাদের কলেজের ছাত্র-ছাত্রীরা বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন টিমেও অংশ নিয়ে আন্তঃবিশ্ববিদ্যালয় প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে তাদের প্রতিভা প্রদর্শন করে। উল্লেখ্য, আমাদের কলেজের ছাত্র শ্রী সূর্য মুখোপাধ্যায় Universal Yoga Sports Federation আয়োজিত World Yoga Cup-এ অংশগ্রহণ করে এবং সেখানে স্বর্ণপদক অর্জন করে আমাদের মহাবিদ্যালয়ের মুকুটে আরো একটি গৌরবের পালক যোগ করেছে।

আমাদের মহাবিদ্যালয়ের এন. এস. এস. বিভাগ শিক্ষার্থীদের সামাজিক বিকাশকে আরো ত্বরান্বিত করে বিভিন্ন সামাজিক কাজের মধ্য দিয়ে। মহাবিদ্যালয়ের পার্শ্ববর্তী গ্রামগুলিতে গিয়ে সেখানকার মানুষদের স্বাস্থ্য ও সমাজ সম্পর্কে সচেতনতা গড়ে তোলা, বিভিন্ন আন্তর্জাতিক ও জাতীয় দিবস পালনের মাধ্যমে তাদের হাতে-কলমে শেখানো হয় কীভাবে সমাজের পাশে, সমাজের কল্যাণে এগিয়ে আসতে হয়। এছাড়াও আমাদের কলেজের ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে অনেকেই এন. এস. এস-এর মাধ্যমে প্রজাতন্ত্র দিবসে দিল্লীতে

রিপাবলিক ডে প্যারেডেও অংশগ্রহণ করেছে বেশ কয়েকবার।

মহাবিদ্যালয়ের এন. সি. সি. বিভাগ ছাত্র-ছাত্রীদের দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ করে তোলে। তাদের মধ্যে অনেকেই আমাদের দেশের সামরিক বিভাগে কর্মরত থেকে আমাদের মাতৃভূমি, আমাদের ভারতমাতার সেবা করে চলেছে।

শিক্ষার প্রধান লক্ষ্য শিক্ষার্থীর সর্বাঙ্গীন বিকাশসাধনের সাথে সাথে সমাজের বিকাশসাধন করা। স্বামী বিবেকানন্দ শিক্ষা সম্পর্কে বলেছেন - ''শিক্ষার্থীর অন্তর্নিহিত সত্ত্বার পরিপূর্ণ বিকাশসাধন করাই হল শিক্ষা।" অর্থাৎ প্রতিটি শিশু কিছু না কিছু প্রতিভা নিয়েই জন্মগ্রহণ করে। সেই প্রতিভা শিশুর মধ্যে সুপ্ত অবস্থায় থাকে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠান উপযুক্ত পরিবেশ রচনা করে শিক্ষার্থীর সেইসব সুপ্ত প্রতিভার পরিপূর্ণ বিকাশে সহায়তা করে। আমাদের নেতাজী মহাবিদ্যালয় সবদিক থেকেই এরকম এক শিক্ষাবান্ধব পরিবেশ রচনা করে রেখেছে, যেখানে শিক্ষার্থীরা নিজেদেরকে উপযুক্তভাবে বিকশিত করে তুলতে পারে এবং পরবর্তী জীবনে তারা সমাজকে বিভিন্নভাবে উপকৃত করতে পারে।

জন্মলগ্ন থেকে এতদিন পর্যন্ত নেতাজী মহাবিদ্যালয় যেমনভাবে শিক্ষার্থীদের সামগ্রিক বিকাশে সহায়তা করে চলেছে, যতদিন চন্দ্র-সূর্য-গ্রহ থাকবে, প্রার্থনা করি ততদিন যেন নেতাজী মহাবিদ্যালয় একইভাবে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে থাকে এবং আরো হাজার হাজার শিক্ষার্থীদের ছায়া দান করে।

শিক্ষার বিস্তারে নেতাজী মহাবিদ্যালয়

শিউলি কোয়ার

জ্ঞান হল তাই যা মানুষের অজ্ঞানতা দূর করে অন্ধকারকে দূরীভূত করতে সাহায্য করে। মনের মলিনতাকে পরিচ্ছন্ন করতে সচেষ্ট হয়। 'বৃহদারণ্যক উপনিষদ্'-এ বলা হয়েছে 'অসতো মা সদ্গময়, তমসো মা জ্যোতির্গময়, মৃত্যোর্মামৃতং গময়।' অর্থাৎ 'নিজের সত্ত্বাকে অসৎ থেকে সত্যের পথে, অন্ধকার থেকে আলোর, মৃত্যু থেকে অমৃতে নিয়ে যেতে হবে। শিক্ষার মধ্যে দিয়ে যে জ্ঞান অর্জন করা হয়, সেই জ্ঞান জীবনের সব সংকীর্ণ দিককে পরাজিত করে। ব্যক্তিকে নিজের দেবত্বসত্ত্বাকে মেলে ধরতে সাহায্য করে।'

স্বামী বিবেকানন্দ বলেছেন, "Education is the manifestation of the perfection already in man. ....We want that education by which character is formed, strength of mind is increased, the intellect is expanded and by which one can stand on one's own feet."। অর্থাৎ শিক্ষার দ্বারা চরিত্র সংগঠিত হবে, মানসিক দৃঢ়তা, বুদ্ধিমত্তার বিকাশ ঘটবে। মানুষের মধ্যে নিহিত আছে অনেক সম্ভাবনা, শিক্ষা এই সম্ভাবনাগুলিকে পূর্ণতা প্রদান করে এদের বিকশিত করবে। আত্ম বিকাশের ক্ষেত্রকেও উর্বর করে তুলবে। গুরুদেব রবীন্দ্রনাথের মতে, "The highest education is that which does not merely give us information but makes our life in harmony with all existence."

আমাদের প্রিয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান নেতাজী মহাবিদ্যালয় সেই ১৯৪৮ সাল থেকে শিক্ষার ঐ গুরুত্বপূর্ণ দায়ভারগুলিকে বহন করে আসছে। আমাদের কলেজটি তৎকালীন সমাজে মানুষের মধ্যে জমে থাকা অজ্ঞানতা, কুসংস্কার, মলিনতাকে দূরীভূত করতে সমর্থ হয়েছে। সেই সময় থেকে আজ পর্যন্ত এই প্রতিষ্ঠান জ্ঞানের বিস্তার করেই চলেছে। তার শেষ নেই। উল্লেখ্য, সেইসময়ে কালিপুর তথা এই অঞ্চল সংলগ্ন বহু গ্রাম থেকে অসংখ্য মানুষ শিক্ষা গ্রহণ করার সুযোগ পেয়েছেন এই প্রতিষ্ঠান থেকে। যেমন- কালিপুর, হরিপুর, সাজিডাঙ্গা, ধূলেপুর, শ্যামবাটি, জয়রামপুর, জয়কৃষ্ণপুর, অমরপুর, মথুরা, আমডোবা, মুক্তারপুর ইত্যাদি গ্রামের মানুষগুলিকে শিক্ষার আলো পৌঁছে দিতে সচেষ্ট হয়েছিল। তখন অর্থনৈতিক অবস্থা ঐ সকল গ্রামগুলিতে বেশ খারাপ ছিল। শিক্ষাকে গ্রহণ করার মতো মানসিকতারও অভাব ছিল। নেতাজী মহাবিদ্যালয় কিন্তু পেরেছিল ঐ সকল প্রতিকূল পরিস্থিতিতেও শিক্ষাকে সকলের মধ্যে পৌঁছে দিতে।

বর্তমান সময়ের পরিপ্রেক্ষিতে আমাদের কলেজ মাথা উঁচু করে তার নিজের জায়গাতেই সগর্বে

* অধ্যাপিকা, দর্শন বিভাগ

অবস্থান করে আছে। এখন শুধু গ্রামগুলি থেকে নয়, অনেক শহর, বিভিন্ন জেলা, এমনকি অন্য রাজ্য থেকেও ছাত্র-ছাত্রীরা শিক্ষা গ্রহণ করার জন্য এগিয়ে আসছে। মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়ের অনুপ্রেরণায় আমাদের কলেজে প্রতিটা ভবন সমানতালে এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষাবিস্তারের ভূমিকাকে বাস্তবিক প্রয়োগের ক্ষেত্রভূমি হিসাবে গড়ে তুলেছে। ছাত্র-ছাত্রীরা শুধু রাজ্য নয়, দেশে ও দেশের বাইরেও পৌঁছে গেছে তাদের intellectual performance এর জন্য। এদের শিক্ষার ভিত্তি হল তাদের সেই প্রিয় কলেজ নেতাজী মহাবিদ্যালয়। এই কলেজের ছাত্র-ছাত্রীরা M.A, Ph.D, Postdoctoral করার জন্য পৌঁছে গেছে রাজ্য, রাজ্যের বাইরে ও বিদেশের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় তথা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিতে। যেমন - ১। বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়, ২। বাঁকুড়া বিশ্ববিদ্যালয়, ৩। ডায়মণ্ড হারবার বিশ্ববিদ্যালয়, ৪। কাজী নজরুল বিশ্ববিদ্যালয়, ৫। বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয়, ৬। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়, ৭। প্রেসিডেন্সি বিশ্ববিদ্যালয়, ৮। রবীন্দ্র ভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, ৯। সিধু-কানহ্ বিশ্ববিদ্যালয়, ১০। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১১। কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়, ১২। বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, ১৩। বেনারস হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়, ১৪। আই. আই. টি. খড়্গপুর বিশ্ববিদ্যালয়, ১৫। ইন্ডিয়ান ইন্সটিটিউট অব টেকনোলজি, মুম্বাই, ১৬। পশ্চিমবঙ্গ রাষ্ট্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়, ১৭। রাজস্থান কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়, ১৮। এন. আই. টি, দুর্গাপুর, ১৯। ন্যাশানাল ইন্সটিটিউট অব সিঙ্গাপুর, সিঙ্গাপুর, ২০। টেকশাস মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়, ইউ. এস. এ, ২১। টেকশাস রাজ্য বিশ্ববিদ্যালয়, ইউ. এস. এ, ২২। সাউথ কোরিয়া বিশ্ববিদ্যালয়, ২৩। আই. আই. সি. বি - ইন্ডিয়া, ২৪। অ্যাকাডেমিকা সিনিকা - তাইওয়ান, ২৫। এন. আই. এইচ - ইউ. এস. এ, ২৬। বাইলোর মেডিসিন কলেজ, ইউ. এস. এ, ২৭। আই. সি. এফ. এ. আই বিশ্ববিদ্যালয়, ত্রিপুরা।

আমাদের এই মহাবিদ্যালয়টি শুধু শিক্ষা নয়, সংস্কৃতির দিকটিকেও সমৃদ্ধ করেছে। সংস্কৃতি একটি জাতির পরিচয় পত্র বহন করে। স্বামী বিবেকানন্দ শিকাগো ধর্মমহাসম্মেলনে আমাদের ভারতবর্ষের মহত্বকে তুলে ধরেছিলেন। তিনি বোঝাতে সমর্থ হয়েছিলেন যে, "আমাদের ভারতবর্ষ হল সেই দেশ, যা অন্যান্য ধর্মের মানুষকে, সংস্কৃতির মানুষকে বিনা আপত্তিতে, বিনা বাধায় গ্রহণ করতে পারে"। গুরুদেব রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 'ভারততীর্থ' কবিতাতে স্পষ্ট করেই বলেছেন -

"দিবে আর নিবে, মিলাবে মিলিবে যাবে না ফিরে
এই ভারতের মহামানবের সাগরতীরে।"

তাইতো আমাদের প্রিয় কলেজ সেই সমৃদ্ধ সংস্কৃতির বিস্তার করে চলেছে। এখানে বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হয়ে থাকে, যার মধ্যে দিয়ে ছাত্র-ছাত্রীরা তাদের আচার, আচরণ, নৈতিক বোধ, উচিত-অনুচিত, ভাল-মন্দ, অহিংসা, সততা ইত্যাদি সদ্ গুণগুলিকে আয়ত্ত করতে শিখে নেয়। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, 'বসন্ত উৎসব', 'শিক্ষক দিবস', 'সরস্বতী পূজা', 'স্বাধীনতা দিবস উদ্‌যাপন', 'প্রজাতন্ত্র দিবস উদ্‌যাপন' এবং অন্যান্য সাংস্কৃতিক

অনুষ্ঠানগুলি অনুষ্ঠিত হয়ে চলেছে প্রতি বছর।

National Cadet Corps, National Service Scheme (NCC, NSS) গুলিও আমাদের কলেজকে সমৃদ্ধ করে যাচ্ছে। ছাত্র-ছাত্রীরা অনেক নিয়মশৃঙ্খলা, দায়িত্ববোধ, সামাজিক দায়বদ্ধতা, নৈতিক মূল্যবোধ ইত্যাদি মানবিক গুণগুলিকে আয়ত্ত করতে পেরেছে ঐ unit গুলির মাধ্যমে। এই unit গুলি বিভিন্ন কর্মসূচী পালন করে থাকে। যেমন - 'Road safety week', 'Swachh Bharat Mission', 'International Yoga Day', 'Blood Donation Camp', 'Sports Activity', 'NCC Excursion', 'Digital Class / E Education', 'Literacy Campaign', 'Dengue Prevention Camp' ইত্যাদি।

সব মিলিয়ে আমাদের কলেজের ছাত্র-ছাত্রীরা যেমন বুদ্ধিমত্তা সহকারে শিক্ষাকে অর্জন করে চলেছে, তেমনি তাদের সমৃদ্ধ সংস্কৃতির বহিঃপ্রকাশ ঘটে চলেছে সর্বক্ষেত্রে। তাদের বিনম্র আচার, আচরণ, ব্যবহার, যে কোন সময়ে, যে কোন পরিস্থিতিতে পরিলক্ষিত হওয়ার মতো। তারা প্রমাণ করে চলেছে যে, তারা তাদের প্রিয় মহাবিদ্যালয়টির ছাত্র-ছাত্রী। তাই নেতাজী মহাবিদ্যালয় জ্ঞান বিস্তারের ক্ষেত্রে যে সক্রিয় দায়ভার বহন করে চলেছে তা শেষ হওয়ার নয়। তাইতো ছাত্র-ছাত্রীরা কবিগুরুর সেই বিখ্যাত গানের শব্দগুলিকে আত্মস্থ করতে সক্ষম হয়েছে।

"... আমার মুক্তি সর্বজনের মনের মাঝে,
দুঃখ বিপদ - তুচ্ছ - করা কঠিন কাজে।
বিশ্বধাতার যজ্ঞশালা আত্মহোমের বহ্নি জ্বালা ...
জীবন যেন দিই আহুতি মুক্তি-আশে।"

অনলাইন শিক্ষাব্যবস্থা ও নেতাজী মহাবিদ্যালয়

উদয় সাউ

সারমর্ম ঃ আমরা প্রত্যেকেই জানি চীনের উহান প্রদেশে উদ্ভূত Corona Virus Disease 2019 বা COVID-19 অতি দ্রুত বিশ্বের বিভিন্ন দেশে ছড়িয়ে পড়ে। এই ভাইরাস বিশ্ব জুড়ে মহামারি সৃষ্টি করেছিল। প্রথমদিকে এই ভাইরাসের সাথে মোকাবিলা করার মত নির্দিষ্ট কোনো ওষুধ বা চিকিৎসা ব্যবস্থা না থাকায় বিশ্বের অধিকাংশ দেশে ভাইরাস থেকে মানুষকে রক্ষা করার প্রাথমিক উপায় হিসাবে লকডাউন-এর পথ বেছে নিয়েছিল। গত বছর মার্চের মাঝামাঝি সময় থেকে দেশের সমস্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। তারপর দীর্ঘ সময় ধরে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলি বন্ধ থাকায় বিভিন্ন স্তরের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলি শিক্ষাদানের মাধ্যম হিসাবে অনলাইন শিক্ষাকে বেছে নিয়েছিল। লকডাউন ও তার পরবর্তী সময় পর্বে কলেজ স্তরে অনলাইন শিক্ষার অসুবিধার দিকটি তুলে ধরেছি। আমার গবেষণার লক্ষ্য হলো কলেজ স্তরে অনলাইন শিক্ষা ব্যবস্থায় শিক্ষার্থীদের অসুবিধা ও সমস্যাগুলি বিশ্লেষণ করা। এজন্য আমি আমার কলেজের ২২ জন শিক্ষার্থীকে বেছে নিয়েছি এই কাজের জন্য। এই সম্পর্কিত বিভিন্ন প্রশ্নগুলি তাদের সাথে ফোনে কথা বলে ও প্রশ্নোত্তর পর্বে তথ্য সংগ্রহ করেছি।

সূচক শব্দ ঃ- কোভিড-19, মহামারী, লকডাউন, অনলাইন শিক্ষা।

লক্ষ্য ঃ- গোটা বিশ্ব COVID-19 ও তার বিভিন্ন ভ্যারিয়েন্ট এর সাতে চ্যালেঞ্জের মুখে দাঁড়িয়ে। এই মহামারী সমগ্র দুনিয়াকে এক ধাক্কায় অনেকটাই বদলে দিয়েছে। লকডাউন, সামাজিক বিচ্ছিন্নতা মানুষের জীবনধারা ও শিক্ষা পদ্ধতিকে অনেকটাই বদলে দিয়েছে। আমার গবেষণার লক্ষ্য হল তরুণ শিক্ষার্থীদের বিশেষত কলেজ স্তরের শিক্ষার্থীদের অনলাইন শিক্ষা ব্যবস্থার কিছু সমস্যা ও অসুবিধাগুলি বিশ্লেষণ করা।

পটভূমি ঃ- কোভিড-19 এর প্রথম উপস্থিতি চীনের উহান প্রদেশে লক্ষ্য করা যায়। বিশ্বের বিভিন্ন দেশে এই ভাইরাস সংক্রমণের প্রকোপ বৃদ্ধি পাবার দরুন ২০০০ সালের ১১ই মার্চ WHO এটিকে বিশ্ব মহামারী রূপে স্বীকৃতি দেয়। এই মহামারীর পরিস্থিতিতে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলি জাতীয় বা স্থানীয় পর্যায়ে বন্ধ করে দেওয়া হয়। ২৪শে মার্চ, ২০২০ ভারত সরকার দেশব্যাপী লকডাউন ঘোষণা করেন। এই সময় দেশের বিভিন্ন ধরণের অফিস, কারখানা, জিম, রেস্তোরাঁ, সমস্ত কিছু বন্ধ রাখা হয়েছিল। কর্মচারীদের বাড়িতে

* অধ্যাপক, ইতিহাস বিভাগ

থেকেই কাজ করতে বলা হয় যা 'Work from Home' নামে পরিচিত। মানুষজন এই শব্দটির সাথে অধিক পরিচিত হয়ে ওঠে এবং অনেকেই এভাবেই কাজ করতে অভ্যস্ত হন। এই ব্যাপারটি শিক্ষাক্ষেত্রেও লক্ষ্য করা গেছে। এই পরিস্থিতিতে প্রযুক্তির দৌলতে অনলাইন মোডে শিক্ষাদান ও শিক্ষাগ্রহণ পর্ব শুরু হয়।

দেশের অন্যান্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলির মতো আমাদের মহাবিদ্যালয়ও করোনা সময়কালে শিক্ষাদান ও পঠন-পাঠন ব্যবস্থা অব্যাহত রেখেছিল অনলাইন ব্যবস্থার হাত ধরে। করোনা সময়কালে লকডাউনের পরিপ্রেক্ষিতে পুস্তকের দোকানগুলি দীর্ঘদিন বন্ধ ছিল, বন্ধ ছিল বহু প্রকাশনার কাজও।এই পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে ছাত্র-ছাত্রীদের পড়াশোনায় যাতে কোন রকমভাবে অসুবিধা না হয়, সেইজন্য কলেজ কর্তৃপক্ষের নির্দেশে অনলাইন রুটিনের একটি সময় থাকতো, যেখানে ছাত্র-ছাত্রীরা ইন্টারকেশন-এর সুযোগ পেতো ও সেইসাথে প্রত্যেকটি বিষয়ের প্রতিটি পেপারের স্টাডি মেটেরিয়াল অনলাইন প্লাটফর্ম গুগুল ক্লাসরুমে দিয়ে দেওয়া হতো। যদিও লকডাউনের একেবারে প্রথম পর্বে হোয়াটস্‌অ্যাপই সক্রিয় মাধ্যম হিসাবে ব্যবহৃত হয়েছিল। কিন্তু ২০২০-এর জুলাই নাগাদ নতুন শিক্ষা বর্ষের রুটিন চালু হবার পর প্রত্যেক শিক্ষকই গুগুল মিট ও গুগুল ক্লাসরুম অত্যন্ত দক্ষতার সাথে ব্যবহার করেছিলেন।

অনলাইন শিক্ষার প্রসার ঘটেছে বেশকিছু প্লাটফর্মের হাত ধরে। প্রথমদিকে হোয়াটস্‌অ্যাপকে ভিত্তি করে শিক্ষাদান শুরু হয়েছিল, তখন অনেকেই আধুনিক প্রযুক্তি ও অ্যাপের সাথে সবাই পরিচিত ছিলেন না। তারপর জুম প্লাটফর্মে শিক্ষাদান শুরু করলেন, যদিও এক্ষেত্রে তথ্যের নিরাপত্তা ও সুরক্ষা নিয়ে প্রশ্ন ওঠায় ব্যবহারকারীরা জুমকে এড়িয়ে গুগুল মিটের দিকে ঝুঁকে পড়েন। অনলাইন শিক্ষাদানের ক্ষেত্রে গুগুল মিট এবং গুগুল ক্লাসরুম আজ খুবই জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে। কিছু কিছু ক্ষেত্রে ইউটিউব, টেলিগ্রাম প্লাটফর্ম অনলাইন শিক্ষার ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হচ্ছে। অনলাইন শিক্ষার ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীদের সমস্যা ও অসুবিধাগুলি আমি এখানে তুলে ধরার চেষ্টা করেছি।

উপকরণ ও পদ্ধতি ঃ- তথ্য সংগ্রহের জন্য প্রশ্নপত্র ভিত্তিক অধ্যয়ন করা হয়েছে এবং সেইসাথে তাদের মতামত নেওয়া হয়েছে। একটি প্রশ্নপত্র তৈরি করে কলেজের প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় বর্ষের ২২ জন ছাত্র-ছাত্রীকে দেওয়া হয়েছিল। প্রশ্নপত্রে বয়স, লিঙ্গ, বাসস্থান, এলাকা সম্পর্কিত যেমন ব্যক্তিগত তথ্য জানতে চাওয়া হয়েছিল, অন্যদিকে তেমনি অনলাইন শিক্ষা ও তার সমস্যাগুলি সম্পর্কেও প্রশ্ন দেওয়া হয়েছিল। এম এস এক্সেল ব্যবহার করে তথ্য সংগ্রহ ও বিশ্লেষণ করা হয়েছে এবং ফলাফলগুলি গণনা করে শতাংশে প্রকাশ করা হয়েছে।

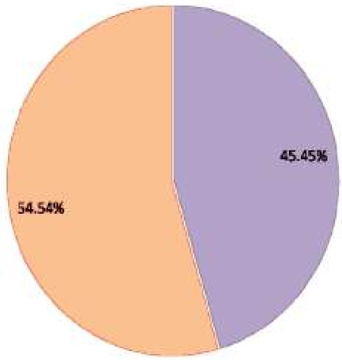

Male vs Female Participants

Total Participants	F	M
22	10	12

Table No.-1

অনলাইন ব্যবস্থায় অংশগ্রহণকারী ছাত্র-ছাত্রীদের অনুপাতের প্রসঙ্গটি টেবি নং ওয়ানে তুলে ধরা হয়েছে। এখানে দেখা যাচ্ছে যে, অংশগ্রহণকারী ২২ জন শিক্ষার্থীর মধ্যে ছাত্রী শিক্ষার্থীর সংখ্যা ছিল ১০ জন, যা শতকরাও ৪৫.৪৫ জন। আবার অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে ছাত্র ছিল ১২ জন, যা শতকরায় ৫৪.৫৪ জন। অর্থাৎ সাধারণ ভাবে বলা যায় যে, ছাত্রদের তুলনায় ছাত্রীদের অংশগ্রহণের হার ছিল কম।

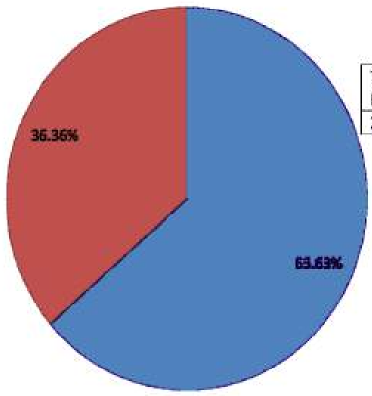

Residence of Participants
Urban vs Rural Area

Total Participants	Rural Area	Urban Area
22	14	08

Table No.-2

ছাত্র-ছাত্রীদের বাড়ির অবস্থানের চিত্রটি টেবিল নং-২-এ তুলে ধরা হয়েছে। এখানে দেখানো হচ্ছে যে, অংশগ্রহণকারী শিক্ষার্থীদের মধ্যে কাদের বাড়ি গ্রামাঞ্চলে এবং কাদের বাড়ি শহরাঞ্চলে। ২২ জন শিক্ষার্থীর মধ্যে গ্রামাঞ্চলে বাড়ি রয়েছে এমন শিক্ষার্থীর সংখ্যা ছিল ১৪ জন, যা শতকরায় ৬৩.৬৩ জন। সেই তুলনায় শহরাঞ্চলে বাড়ি ছিল ৮ জন শিক্ষার্থীর, যা শতকরায় ৩৬.৩৬ জন। শহর ও গ্রামাঞ্চল থেকে শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণের চিত্রটি এখানে তুলে ধরা হয়েছে। গ্রামাঞ্চলে বাড়ি হলেও, শিক্ষার্থীদের মধ্যে শিক্ষাক্ষেত্রে উৎসাহের কোন অভাব ছিল না, একই রকম উৎসাহ দেখা গিয়েছিল শহরাঞ্চলের শিক্ষার্থীদের ক্ষেত্রেও।

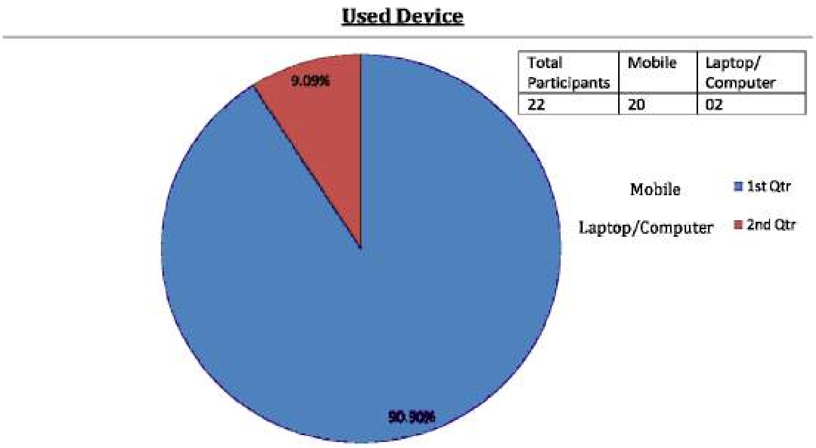

Table No.-3

অনলাইন শিক্ষা ব্যবস্থায় শিক্ষার্থীদের ব্যবহারের মাধ্যমটি এখানে তুলে ধরা হয়েছে। অর্থাৎ অনলাইন ক্লাসে শিক্ষার্থীরা মোবাইল না কম্পিউটার কোন ধরণের ডিভাইস ব্যবহার করতো। শিক্ষার্থীদের অধিকাংশই মোবাইল ব্যবহার করতো, যা ছিল শতকরায় ৯০.৯০ জন এবং কম্পিউটার বা ল্যাপটপ ব্যবহার কারী শিক্ষার্থীর সংখ্যা ছিল তুলনামূলক ভাবে খুবই কম, যা শতকরায় ০৯.০৯ জন। ল্যাপটপ বা কম্পিউটারের তুলনায় মোবাইল ব্যবহার সহজ ও সুলভ হওয়ায় অধিকাংশ জনই মোবাইলের মাধ্যমে অনলাইন শিক্ষায় যুক্ত হয়েছিল।

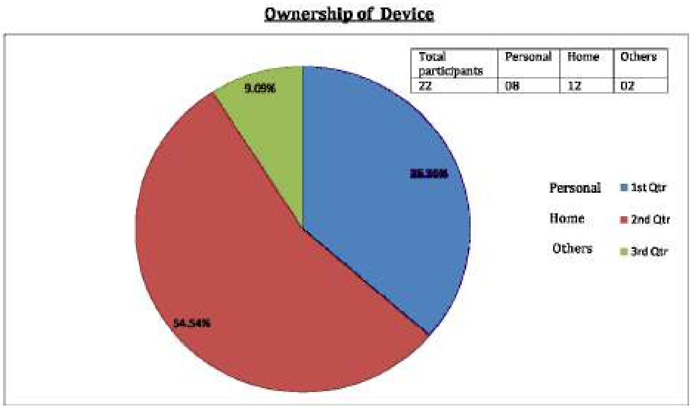

Table No.-4

যে ডিভাইসের মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা অনলাইন ক্লাস করতো সেই ডিভাইস বা মাধ্যমের মালিকানার ব্যাপারটি এখানে তুলে ধরা হয়েছে। শিক্ষার্থীরা তাদের মতো করে অনলাইন ক্লাস করতো। এই অনলাইন শিক্ষায় শিক্ষার্থীদের ব্যবহারকারী ডিভাইস বা মাধ্যমের অধিকাংশই ছিল বাড়ির। অর্থাৎ বাড়ির একটাই অ্যান্ড্রয়েড ফোন এবং সেই ফোনেই শিক্ষার্থী ও তার পরিবারকে প্রয়োজন মেটাতে হতো। এক্ষেত্রে কখনো কখনো

শিক্ষার্থীকে অসুবিধায় পড়তে হতো, আবার কখনো বা পরিবারকে। এই ধরণের শিক্ষার্থী ছিল ১২ জন, যা শতকরায় ৫৪.৫৪ জন। আবার কিছু শিক্ষার্থী নিজেই ব্যক্তিগত ভাবে মোবাইল ব্যবহার করতো এবং তা সর্বদা শিক্ষার্থীর কাছেই থাকতো, এইরকম শিক্ষার্থীর সংখ্যা ছিল ৮ জন, যা শতকরায় ৩৬.৩৬ জন। এছাড়া এমন দু'জন শিক্ষার্থী ছিল, যারা তাদের প্রতিবেশীর সাহায্য নিয়ে অনলাইন ক্লাসে যুক্ত হতো অর্থাৎ যে ডিভাইস বা মাধ্যমের মধ্যে দিয়ে অনলাইন ক্লাস করতো তা শিক্ষার্থী বা তার বাড়ির কারোর ছিল না, তা ছিল অন্য কোন ব্যক্তির। এই সমস্ত শিক্ষার্থীদের অনেক বিধি নিয়মের মধ্যেও নানান অসুবিধায় ক্লাস করতে হতো। যার ডিভাইস থাকতো তার বাড়িতেই কিছু নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত ক্লাস করার সুযোগ পেতো। এই ধরণের শিক্ষার্থীর সংখ্যা ছিল দুজন, যা শতকরায় ০৯.০৯ জন।

Obstacles of Online Clesses

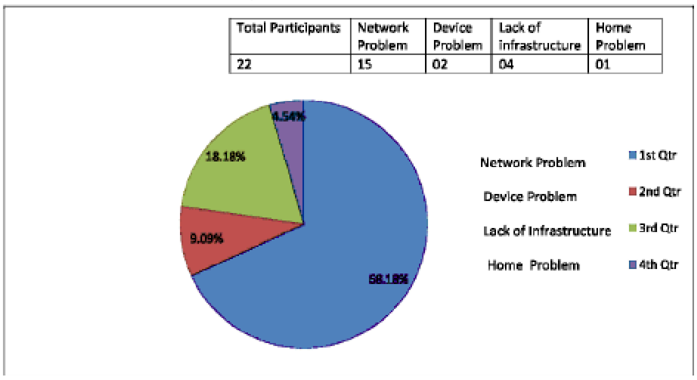

Total Participants	Network Problem	Device Problem	Lack of infrastructure	Home Problem
22	15	02	04	01

Table No.-5

অনলাইন শিক্ষা ব্যবস্থার প্রতিবন্ধকতার দিকটি টেবিল নং-৫ এ তুলে ধরা হয়েছে। সমস্যাগুলি কেমন ধরণের তা চিহ্নিত করে এখানে তুলে ধরা হয়েছে। এক্ষেত্রে প্রথম ও প্রধান সমস্যা ছিল নেটওয়ার্কের সমস্যা অর্থাৎ মোবাইল নেটওয়ার্ক সর্বদা ঠিকঠাক থাকতো না। তবে শিক্ষার্থীরা তাদের মতো করে সর্বদাই ক্লাস করতে চাইতো। নেটওয়ার্কের সমস্যাটি ছিল শতকরার দিক থেকে ৬৮.১৮ ভাগ চিহ্নিত করা হয়েছে। মোবাইল হ্যান্ডসেট স্লো হয়ে গেছে বা ওল্ড ভার্সন বা মেমোরি স্পেস নেই, এতে অনলাইন ক্লাসের অ্যাপস্গুলি শিক্ষার্থীরা ইনস্টল ও আপডেট করতে পারতো না। এই ধরণের শিক্ষার্থী ছিল শতকরায় ০৯.০৯ জন। পরিকাঠামো বলতে এখানে বলা হয়েছে একটি স্থায়ী স্টাডিরুম, সময় মতো ক্লাসের জন্য মোবাইলের সহজলভ্যতা এবং সঠিক সময়মতো নেট রিচার্জ করানো ইত্যাদি সংক্রান্ত ব্যাপারগুলি। এই ধরণের শিক্ষার্থী ছিল শতকরার দিক থেকে ১৮.১৮ জন। আমরা এমন এক ছাত্রী পেয়েছিলাম যে কিনা বাড়ির সমস্যার জন্য সর্বদা অনলাইন ক্লাসে যুক্ত হতে পারতো না। এটিকে অনেকে পিতৃতান্ত্রিক ধারণার সাথে যুক্ত করতে চাইবেন। যাইহোক,

এক্ষেত্রে সেই শিক্ষার্থীর অনলাইন ক্লাসের ব্যাপারটি তার বাড়ির লোকজন উৎসাহী দৃষ্টিভঙ্গিতে দেখেননি।

Status of Students in Online Education

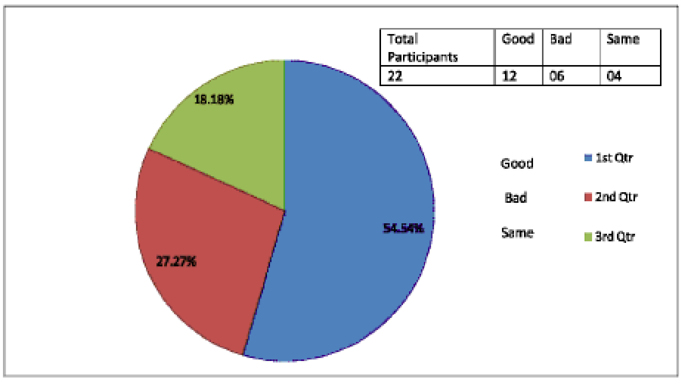

Table No.-6

অনলাইন শিক্ষা ব্যবস্থায় শিক্ষার্থীদের অবস্থানের ব্যাপারটি টেবিল নং-৬ এ তুলে ধরা হয়েছে। অংশগ্রহণকারী শিক্ষার্থীদের মধ্যে ১২ জন শিক্ষার্থী নিয়মিত অনলাইন ক্লাস করতো ও রীতিমতো প্রশ্ন করতো। নতুন অনলাইন শিক্ষা ব্যবস্থায় এই শিক্ষার্থীদের আগ্রহ ও ইচ্ছা অনেকটাই বৃদ্ধি পেয়েছিল। প্রতিদিন অনলাইন ক্লাসের বিষয়টি নিয়ে তারা চর্চা করতো, বিভিন্ন প্রশ্ন জানার চেষ্টা করতো। এই প্রসঙ্গে বলা যায়, অনলাইন শিক্ষা ব্যবস্থায় আমাদের মহাবিদ্যালয়ের প্রতিটি বিভাগের রুটিনের একটি পর্বে ডিসকাশন ও স্টুডেন্ট ফিডব্যাক-এর একটি সেশন ছিল, যেখানে শিক্ষার্থীরা তাদের প্রয়োজন মতো নানান বিষয়ে জেনে নিতো এবং এই ব্যাপারটি শিক্ষার্থীদের পাশাপাশি প্রত্যেক শিক্ষককেই অনলাইন ব্যবস্থায় উৎসাহিত করেছিল। ৬ জন শিক্ষার্থী ছিল যারা শুধুমাত্র ক্লাসে অংশগ্রহণ করতো, তা প্রতিনিয়তন নয়। বিষয় সম্পর্কে প্রশ্ন করা হলে তারা তেমন উত্তর দিতে পারতো না। হয়তো এমনও হতে পারে যে, তারা অনলাইন ক্লাসে গুগুল মিটে জয়েন করে পড়া ছাড়া অন্য কাজে নিযুক্ত হয়ে যেতো কিংবা ঘুমিয়ে পড়তো। সেজন্যই তাদের অগ্রগতি বা প্রগতি খুব একটা হয়নি। আবার চারজন শিক্ষার্থীর পরিস্থিতি ছিল প্রায় একইরকম অর্থাৎ অফলাইন ব্যবস্থার সমরূপ, অনলাইন বা অফলাইন উভয় ব্যবস্থাতেই তারা একই রকম পড়াশোনা করেছিল।

আলোচনা ঃ- কোভিড-19 পরিস্থিতিতে অনলাইন শিক্ষা কীভাবে ছাত্র-ছাত্রীদের প্রভাবিত করেছে এবং এক্ষেত্রে তাদের অসুবিধা ও সমস্যাগুলি তুলে ধরা হয়েছে। অনলাইন শিক্ষা অনেকটা অভিনব হওয়ায় শিক্ষার্থী এই শিক্ষার সাথে তালে তাল মিলিয়ে প্রথম দিকে চলতে পারেনি। সাক্ষাৎকারের ভিত্তিতে জানা যায়, অধিকাংশ

ছাত্র এই অনলাইন শিক্ষার প্রযুক্তি সম্পর্কে এর আগে বিন্দুমাত্র জানত না। অনেকেরই আবার উপযুক্ত অ্যান্ড্রয়েড মোবাইল সেট ছিল না। পরিবর্তিত পরিস্থিতীতে অনলাইন ক্লাস করার জন্য শিক্ষার্থী ও তাদের পরিবারকে অনেক কষ্ট করে ক্লাস করার জন্য মোবাইলের ব্যবস্থা করতে হয়েছিল। সার্ভেতে দেখা গেছে ৫৪.৫৪ শতাংশ ছাত্র-ছাত্রী বাড়ির মোবাইলে ক্লাস করে, কারণ বাড়িতে শুধুমাত্র সেই ফোনটিই সম্বল। বাড়িতে আর্থিক অসুবিধা থাকায় দু'জন শিক্ষার্থী প্রতিবেশীর সাহায্য নিয়ে ক্লাস করে থাকে। আমাদের অধিকাংশ শিক্ষার্থী গ্রামাঞ্চলে থাকায় তাদের ক্ষেত্রে নেটওয়ার্ক সমস্যা খুবই প্রবল। বহু ক্ষেত্রেই শিক্ষার্থীদের ঘরের বাইরে বেরিয়ে যেখানে নেটওয়ার্ক পাওয়া যায়, তারা তা অনুসন্ধান করে ক্লাস করে থাকে। এ থেকে সহজেই অনুমান করা যায় যে, রোদ ও বর্ষার দিনে তাদের কতটা অসুবিধা হয়। এই প্রসঙ্গে বলে রাখা ভালো যে, অনলাইন শিক্ষার তিনটি প্রাথমিক শর্ত হল - একটি নির্দিষ্ট ডিভাইস। যেমন - ফোন বা ল্যাপটপ। দ্বিতীয়ত, নেট সংযোগ। তা হাইস্পিড হলে খুবই ভালো হয় এবং তৃতীয়ত একটি স্টাডি রুম। যেখানে শিক্ষার্থী শান্তিতে ও ধৈর্য্যের সাথে ক্লাস করতে পারবে। যে সমস্ত শিক্ষার্থীদের ওপর সার্ভে করা হয়েছে তাদের অধিকাংশ ক্ষেত্রেই প্রথমটি থাকলেও বাকি দুটি ক্ষেত্রেই তারা অনেকটা চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন। লকডাউন পরিস্থিতিতে অনেক পরিবারের মানুষের আয় কমেছে, কাজ হারিয়েছে; আর্থিক অসুবিধা জনিত কারণে অনেক শিক্ষার্থী যথাসময়ে ফোনে নেট রিচার্জ করতে পারে নি বা উন্নত নেট সংযোগের সুবিধা গ্রহণ করতে পারে নি।

উপসংহার ঃ- প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে আমাদের শিক্ষার্থীদের অনলাইন শিক্ষার সুবিধা-অসুবিধাগুলি তুলে ধরা হয়েছে। রাজ্য ও জাতীয় স্তরেও এই ধরণের সমস্যা ও অসুবিধা রয়েছে। অনলাইন শিক্ষার সমস্যাগুলিকে চিহ্নিত করতে শিক্ষা জগতের সর্বস্তরে ব্যাপক মাত্রায় এই ধরণের সমীক্ষার প্রয়োজন রয়েছে। অনলাইন শিক্ষাদানের ক্ষেত্রে যে সমস্ত প্রযুক্তিগত প্রাথমিক জড়তা ছিল তা মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়ের কল্যাণে ও লাইব্রেরি বিভাগের সহায়তায় আমরা খুব সহজেই প্রতিবন্ধকতা কাটিয়ে উঠতে পেরেছিলাম। অনলাইন ব্যবস্থায় শুধুমাত্র পঠন-পাঠনই নয়, নির্দিষ্ট সময় অন্তর অনলাইনে ছাত্র-ছাত্রীদের মূল্যায়নের ব্যবস্থাও করা হয়েছিল। অনলাইন শিক্ষা ব্যবস্থায় আমাদের মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয় সর্বদাই সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছিলেন। শিক্ষক-শিক্ষিকাদের আবেদনে সাড়া দিয়ে শিক্ষার্থীরা অনলাইন ক্লাসে অংশগ্রহণ করতো এবং তাদের পড়াশোনা বিষয়ক নানা বিষয় তারা জেনে নিতো। এভাবে দেখা যায় অফলাইন শিক্ষা ব্যবস্থায় আমাদের মহাবিদ্যালয়ে ছাত্র-শিক্ষক সুসম্পর্কের যে দীর্ঘ ঐতিহ্য রয়েছে, করোনা সময়কালে অনলাইন শিক্ষা ব্যবস্থার ক্ষেত্রেও তার কোনরূপ ব্যতিক্রম ঘটেনি। হয়তো কিছু ক্ষেত্রে বিক্ষিপ্ত-বিচ্ছিন্ন ঘটনা থাকতে পারে, তবে তা আমাদের খুব একটা নজরে আসেনি। তাই আমরা গর্বের সাথে বলতে পারি যে, অনলাইন শিক্ষা ব্যবস্থায় ছাত্র-শিক্ষক সম্পর্কের ঐতিহ্য বিদ্যমান ছিল এবং এই কৃতিত্বের দাবিদার কলেজ কর্তৃপক্ষের প্রত্যেকেই।

নেতাজী মহাবিদ্যালয় ও রসায়ন বিভাগ ঃ স্মৃতির ক্যানভাসে

ড. স্মিতা শতপথী

'নেতাজী মহাবিদ্যালয়' নামটি শুনলেই মনে একটা শ্রদ্ধা ও ভালোবাসার সৃষ্টি হয়। মনে পড়ে যায়, আমাদের পরম পূজনীয় দেশনায়ক নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুর কথা। ভারতবর্ষ স্বাধীন হওয়ার পর ১৯৪৮ সালে ডাঃ রাধাকৃষ্ণ পাল মহাশয় এই কলেজের প্রতিষ্ঠা করেন। কলেজের প্রতিষ্ঠা ও তার অগ্রগতির ইতিহাস প্রায় সকলেরই জানা। তাই আমি এই বিষয়ে নতুন করে কিছু লিখছি না। আমি বরং এই কলেজ নিয়ে আমার নিজস্ব অভিজ্ঞতার কথা বলার চেষ্টা করি।

কলেজের সাথে আমার সম্পর্ক শৈশবকাল থেকে। আমার বাবা, ড. সুনীল কুমার শতপথী, এই কলেজে রসায়ন বিভাগের অধ্যাপক ছিলেন। তাই কলেজ সম্বন্ধে সম্যক ধারণা না থাকলেও ছোটবেলা থেকেই আমি কলেজে ঘুরতে আসতাম। বাবার সহকর্মীরা তখন থেকেই আমার অভিভাবকের মতো ছিলেন। আমাদের বাড়িটি যে অঞ্চলে রয়েছে সেটি 'প্রফেসর পাড়া' নামে পরিচিত। আমাদের প্রতিবেশীরা বেশীরভাগই শিক্ষক এবং তাঁদের মধ্যে অনেকেই নেতাজী মহাবিদ্যালয়ে অধ্যাপনা করেছেন। তাই ছোট থেকে এই কলেজের কথা শুনেই বড়ো হয়েছি এবং কলেজটির প্রতি ভালোবাসার সূচনা হয়েছে, যা সময়ের সাথে সাথে আরও গাঢ় হয়েছে। কলেজের বিভিন্ন অনুষ্ঠানে বিশেষ করে সরস্বতী পূজা এবং কলেজের বাৎসরিক বনভোজনে যাওয়ার অভ্যেসটা ছোট থেকেই শুরু হয়েছিল, যা এখনও চলছে। কলেজের স্বনামধন্য অধ্যাপকদের সান্নিধ্য আমাকে অনেক সমৃদ্ধ করেছে। আমার স্কুলের পড়াশোনায় ওনারা অনেকভাবে সাহায্য করেছেন। অনেক বই পেয়েছি ওনাদের কাছ থেকে পড়ার জন্য। এমনকি কোনো প্রশ্ন থাকলে বাবার কাছে লিখে দিতাম, ওনারা কলেজে সময় বের করে তার উত্তরও করে দিয়েছেন। তাই স্কুল জীবন থেকেই আমার সাথে কলেজের একটা পরোক্ষ যোগাযোগ তৈরি হয়েছিল।

আমার সাথে রসায়ন বিভাগের অনেক ছাত্র-ছাত্রীদের আলাপ হয়েছিল বিভিন্ন সময় কলেজে আসার সুবাদে। ছোটবেলা থেকেই ওদের কাছে আমি রসায়নের কিছু পরিভাষা ও গঠন শিখেছিলাম। আমি 'বর্ণপরিচয়'এর সাথে তাই 'বেঞ্জিন' আঁকতেও শিখেছিলাম। কিছু দাদা-দিদিদের সাথে এখনও দেখা হলে চিনতে পারেন। এটা আমাকে খুব আনন্দ দেয়। আমার উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষা কেন্দ্রও ছিল নেতাজী মহাবিদ্যালয়। যদিও অতি পরিচিত কলেজ, তবুও কেবলমাত্র ওই সময়টাতে কলেজে আসতে ভয় লাগতো - আসলে ওটা ছিল পরীক্ষার জন্য দুশ্চিন্তা।

* প্রাক্তন ছাত্রী, বর্তমান অধ্যাপিকা, রসায়ন বিভাগ

এবার আসি কলেজ জীবনে। আমি নেতাজী মহাবিদ্যালয় থেকে ২০০৬ সালে রসায়ন বিভাগে স্নাতক (সাম্মানিক) হই। বাবার কাছে ছোটবেলা থেকেই রসায়ন বিভাগের কথা শুনেছিলাম। আমাদের কলেজে ১৯৫৮ সালে বিশুদ্ধ বিজ্ঞান (Pure Science) কোর্স চালু হয়। প্রথমে শিক্ষক হিসাবে ছিলেন অধ্যাপক মদন মণ্ডল এবং অধ্যাপক কালীপদ দত্ত। ১৯৮৩ সাল থেকে রসায়নে অনার্স কোর্স শুরু হয়। বাবা ১৯৮৪ সালে রসায়ন বিভাগে অধ্যাপনা শুরু করেন। তখন বিভাগীয় প্রধান ছিলেন অধ্যাপক নিশিথ ভকত্ চৌধুরী। অন্যান্য শিক্ষকদের মধ্যে ছিলেন অধ্যাপক পূর্ণানন্দ চক্রবর্তী, অধ্যাপিকা যশোধরা দাঁ। ডেমনস্ট্রেটর হিসাবে ছিলেন শ্রী নিখিলচন্দ্র রায় ও শ্রী অমরেন্দ্রনাথ রায়। শ্রী নিখিলচন্দ্র রায় মহাশয় পরবর্তীকালে অধ্যাপক হয়েছিলেন। শিক্ষাকর্মী হিসাবে ছিলেন শ্রী দিলীপ দে, শ্রী শশাঙ্ক বাড়ুই এবং শ্রী নারায়ণ মণ্ডল। ১৯৮৫ সালে স্টোরের দায়িত্ব নেন শ্রী প্রণব দাস। তারপর শিক্ষাকর্মীবন্ধু হিসাবে আসেন শ্রী সনাতন তপস্বী ও শ্রী প্রদীপ ভাণ্ডারী। বাবার কাছে শুনেছি যে, তখন ভৌত, অজৈব ও জৈব রসায়নের অনার্সের ব্যবহারিক ক্লাসের জন্য দুটি পাকা ঘর ছিল। কিন্তু পশ্চিমদিকে একটি অ্যাসবেসটরের ছাউনি দেওয়া ঘরে রসায়ন ও পদার্থ বিদ্যার পাস কোর্সের ব্যবহারিক ক্লাস হত। বিশুদ্ধ বিজ্ঞান ও জীববিজ্ঞানের থিওরি ক্লাস আলাদা করে নেওয়া হতো। ১৯৮৬ সালে প্রথম রসায়নের অনার্স ব্যাচ স্নাতক উত্তীর্ণ হয়েছে।

আমি কলেজে পড়াশোনা করেছি ২০০৩ সাল থেকে ২০০৬ পর্যন্ত। আমি শিক্ষক হিসাবে পেয়েছি বাবা ড. সুনীল কুমার শতপথী (SKS Sir), ড. পূর্ণানন্দ চক্রবর্তী (PC Sir), শ্রী নিখিলচন্দ্র রায় (NCR Sir), ড. অমিত এস তেওয়ারী (AST Sir) এবং ড. বিমল দির্ঘাঙ্গী (BD Sir) কে। শিক্ষাকর্মী হিসাবে তখন ছিলেন প্রণববাবু, প্রদীপবাবু, নারায়ণবাবু ও সনাতনবাবু। আমাদের শিক্ষকেরা অনেক যত্ন সহকারে ক্লাস নিতেন। শিক্ষাকর্মীরা আমাদের অনেক সাহায্য করতেন। ওনারা সকলে আমাদের ভুল-ভ্রান্তিও ক্ষমা করে দিয়েছেন। ওনারা পরীক্ষাগারগুলিকে নিজের বাড়ির মতো গুছিয়ে রেখেছিলেন। বাইরের কলেজের রসায়ন বিভাগের শিক্ষার্থীরা যখন আমাদের কলেজে ব্যবহারিক পরীক্ষা দিতে আসতো, আমাদের বিভাগ তাদের সাথে সবরকম সহযোগিতা করত। আমরা শিক্ষকদের কাছ থেকে শ্রেণীকক্ষের বাইরেও অনেক সহযোগিতা পেয়েছি। যখনই কোনো প্রশ্ন জানতে চেয়েছি, ওনারা স্বতঃস্ফূর্তভাবে উত্তর দিয়েছেন। ওনারা শিক্ষার্থীদের নিরপেক্ষভাবে সাহায্য করেছেন। শিক্ষার্থীরা স্নাতক হওয়ার পর যখন স্যারদের সাথে দেখা করতে আসতো, ওনারা তাদের উচ্চশিক্ষায় শিক্ষিত হওয়ার জন্য উৎসাহ দিতেন। এমনকি যে সব শিক্ষার্থী পরীক্ষার প্রতি অহেতুক ভীতির কারণে পরীক্ষা দেবে না বলে স্থির করতো, তখন আমাদের শিক্ষকেরা তাদের আত্মবিশ্বাস বাড়িয়ে তুলতেন। এর ফলস্বরূপ তারা অনেকেই সেই বৎসর পরীক্ষা দিয়ে সাফল্যও পেয়েছে। এখান থেকেই একজন আদর্শ শিক্ষক কীরকম হওয়া উচিত, তার ধারণা আমি পাই, যা আমাকে ভবিষ্যতে শিক্ষকতা করতে

অনুপ্রেরণা জুগিয়েছে।

প্রথমেই PC স্যার (ড. পূর্ণানন্দ চক্রবর্তী)-এর কথা বলতে চাই। স্যারকে আমি ছোটবেলা থেকেই চিনি। উনি আমার প্রতিবেশী। তাই ছোট থেকে ওনাকে জেঠু বলেই ডাকতাম। উনি ভৌত রসায়নকে এত সুন্দরভাবে আমাদের সামনে উপস্থাপনা করতেন যে, অনেক কঠিন বিষয়ও আমাদের কাছে সহজ হয়ে যেত। স্যার তখন বিভাগীয় প্রধান ছিলেন। স্যার আমাদের রসায়ন বিভাগকে এতটাই ভালোবাসতেন যে, নিজে দায়িত্ব নিয়ে পরীক্ষাগারটিকে সুন্দরভাবে সাজিয়ে রেখেছিলেন। আমাদের বলতেন যে, যন্ত্রপাতিগুলিকে নিজের জিনিস ভেবে ব্যবহার করবে। তার সাথে মজা করে এটাও বলতেন যে - যন্ত্রপাতিগুলি নিজের মনে করে বাড়ি নিয়ে যেও না। স্যার আমাদের পরীক্ষাগারের কাচের জিনিসগুলিকে যত্নসহকারে ব্যবহারের কথা বলতেন, যাতে সেগুলি ভেঙে নষ্ট না হয়।

SKS স্যার (ড. সুনীল কুমার শতপথী), আমার বাবা। উনি অজৈব রসায়ন পড়াতেন। উনি স্বনামধন্য ড. RLD স্যারের কাছে গবেষণা করেছেন। RLD স্যারের বই রসায়নের সকল শিক্ষার্থীদের কাছে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি বই। ছোট থেকেই অজৈব রসায়ন এর পরিবেশে থেকে আমিও অনুপ্রাণিত হই ও পরবর্তীকালে অজৈব রসায়ন নিয়ে স্নাতকোত্তর স্তরে পড়াশোনা করি ও গবেষণা করি। অজৈব রসায়ন ছাড়াও বাবার কাছে শিখেছি কীভাবে সমস্ত বই, নথি, প্রশ্নপত্র সংরক্ষণ করে রাখতে হয়। শুধু কলেজ জীবনে নয়, বর্তমানে আমি শিক্ষিকা হিসাবে কর্মজীবন শুরু করার পরেও ব্যবহারিক ক্লাসে কোনো অসুবিধায় পড়লে ওনার সহযোগিতা ও পরামর্শ পেয়ে থাকি।

NCR স্যার (শ্রী নিখিলচন্দ্র রায়) কে আমি ছোটবেলা থেকে চিনতাম। স্যার আর আমাদের মধ্যে নেই। উনি আমাদের জৈব রসায়ন পড়াতেন। স্যার সবার সাথে খুব সহজভাবে মিশতে পারতেন। উনি আমাকে 'নাদ মহাপাত্র ঘোষাল' এর ব্যবহারিক রসায়নের একটা বই উপহার দিয়েছিলেন। বইটিতে ওনার স্বাক্ষর আছে। আমি বইটি পরম যত্নে রেখে দিয়েছি। স্যারের স্মৃতি সর্বদা আমাদের মনে রয়ে যাবে।

AST স্যার (ড. অমিত এস তেওয়ারী) আমাদের জৈব রসায়ন পড়াতেন এবং এখনও পড়ান। স্যারের অভিনব উপস্থাপনা, সুন্দর বাচনভঙ্গি ও কণ্ঠস্বর জৈব রসায়নের উপর আমাদের আগ্রহ তৈরি করেছিল। আমরা স্যারের ক্লাস কোনোভাবেই মিস করতাম না। স্যার জৈব রসায়নের বিক্রিয়ার কলাকৌশল এবং জৈব যৌগের অনেক জটিল গঠন সহজ করে আমাদের বুঝিয়ে দিয়েছেন। স্যার তিনটি ভাষায় (বাংলা, হিন্দী এবং ইংরাজী) সমানভাবে পারদর্শী। স্যারের কাছে প্রায়ই অনেক প্রশ্ন নিয়ে হাজির হতাম এবং উনি খুব খুশি হয়েই সেগুলি সমাধান করে দিয়েছেন। এখনও যে কোনো সমস্যায় পড়লে স্যারের কাছ থেকে সহযোগিতা ও সুপরামর্শ পেয়ে থাকি।

BD স্যার (ড. বিমল দীর্ঘাঙ্গী) আমাদের অজৈব রসায়ন পড়াতেন। ওনার ক্লাস থেকে বিশ্লেষণী রসায়নের অনেক তথ্য আয়ত্ত করতে পেরেছি। উনি পরবর্তী কালে Government College এ চলে যান।

শিক্ষাকর্মীরা আমাদের ব্যবহারিক ক্লাসে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। প্রণববাবু স্টোর থেকে প্রয়োজনীয় রাসায়নিক খুঁজে বের করে দিতেন এবং প্রয়োজনীয় দ্রবণ তৈরি করে দিতেন। উনি এখনো আমাদের সাহায্য করে চলেছেন। সনাতনবাবু, প্রদীপবাবু ও নারায়ণবাবু শিক্ষার্থীদের কাছে প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি পৌঁছে দিতেন। গ্যাস সরবরাহ করা, বার্নার সব ঠিকভাবে কাজ করছে কিনা সেগুলিও দেখতেন। এ প্রসঙ্গে একটা মজার কথা বলি। আমাদের ব্যবহারিক ক্লাস নির্দিষ্ট সময়ে শুরু হত কিন্তু কখন শেষ হবে জানা ছিল না। প্রদীপবাবু মাঝে মাঝে বলতেন - আর কতক্ষণ ক্লাস করবে? অন্ধকার হয়ে যাবে তো? আমরাও মজা করে বলতাম - 'প্রদীপদা আছেন তো, আলোর অভাব হবে না।' সত্যি ওই দিনগুলি আর ফিরে আসবে না। তখন হয়তো পরিকাঠামো এখনকার মতো উন্নত হয়নি। অত্যাধুনিক যন্ত্রপাতির অভাব ছিল। কিন্তু পড়াশোনার মান অনেক উন্নত ছিল। তাই দেখা যায়, আমাদের বিভাগের বহু ছাত্র-ছাত্রী এখন বিভিন্ন দেশের গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠানে সুপ্রতিষ্ঠিত।

কলেজ থেকে স্নাতক হওয়ার পরও কলেজের সাথে আমার যোগাযোগ ক্ষুণ্ণ হয়নি। কোনো সরস্বতী পুজোতে কলেজে আসিনি - তা কিন্তু এখনো পর্যন্ত হয়নি। এরপর আমি বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি পাই এবং অজৈব রসায়ন নিয়ে গবেষণা করি। তারপর নেতাজী মহাবিদ্যালয়ে রসায়ন বিভাগে অতিথি অধ্যাপক হিসাবে যোগদান করি ২০১৫ সালের সেপ্টেম্বর মাসে। তখন পুরোনো স্যারদের মধ্যে ছিলেন বিভাগীয় প্রধান হিসাবে AST স্যার। অজৈব রসায়নে অধ্যাপক হিসাবে এসেছেন ড. কৃশানু সরকার। আংশিক সময়ের শিক্ষক হিসাবে ছিলেন শ্রীমতী মৌসুমী মণ্ডল। অতিথি অধ্যাপিকা হিসাবে ছিলেন আমাদের কলেজের প্রাক্তন ছাত্রী মুক্তি দে ও পাপিয়া সাঙ্কি। আমার সাথে আরও একজন যোগদান করেছিলেন, তিনি হলেন শ্রী কৌশিক ঘোষ। উনিও আমাদের কলেজের প্রাক্তন ছাত্র। এখন স্যারদের সহকর্মী হয়ে গেলাম। প্রথম একটা ভয়মিশ্রিত আনন্দ অনুভব করছিলাম। কিন্তু দু-একদিনের মধ্যেই সব ভয় চলে গিয়ে কেবলমাত্র আনন্দের অনুভূতিটাই রয়ে গেছে। তবে আমার পুরানো শিক্ষকদের কথা সবসময় মনে পড়ে।

এরপর ২০১৭ সালের ৯ই জুন সহকারী অধ্যাপক হিসাবে নেতাজী মহাবিদ্যালয়ে যোগদান করলাম। WBCSC-র কাউন্সিলিং-এ নেতাজী মহাবিদ্যালয়ই আমার প্রথম পছন্দ ছিল। তাই যখন এই কলেজটিতে যোগদান করার সুযোগ পেলাম, খুবই নস্টালজিক হয়ে পড়েছিলাম। পরে আরও অভিভূত হয়েছি, বাবার পদে আসতে পেরেছি জেনে।

আমার অতি প্রিয় জায়গায় আসতে পেরে আমার আনন্দের সীমা ছিল না। কিছু সময় পর ২০১৮

সালে জৈব রসায়নের সহকারী অধ্যাপক হয়ে যোগদান করেন ড. সতীনাথ সরকার। রসায়ন বিভাগ আমাদের কাছে একটা পরিবারের মতো। তাই অনায়াসেই বিভাগীয় সমস্ত কাজ সমবেত ভাবে করতে পারি। ফলে সেটা নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে সম্পাদন করা সম্ভব হয়। এখন আমাদের সাথে শিক্ষাকর্মী হিসাবে আছেন প্রসেনজিৎ গাঙ্গুলী ও মেঘনাথ পাত্র। প্রণববাবু অবসর গ্রহণ করেছেন ২০১২ সালে। কিন্তু তিনি আমাদের কলেজ এবং রসায়ন বিভাগকে এখনও সাহায্য করে চলেছেন।

আমি যখন কলেজে পড়তাম তখন কলেজের অধ্যক্ষ ছিলেন ড. অসীম কুমার দে মহাশয়। যখন শিক্ষকতা শুরু করলাম তখনও ওনাকে অধ্যক্ষ হিসাবে পেয়েছি। স্যার ছাত্রী হিসাবে আমাকে খুব স্নেহ করেন এবং যেদিন স্যারকে গিয়ে বললাম যে, আমি নেতাজী মহাবিদ্যালয়ে সহকারী অধ্যাপক হিসাবে আসব, স্যার খুব খুশি হয়েছিলেন। এখনো যে কোনো সমস্যা স্যারকে গিয়ে বললে উনি যথাসাধ্য সাহায্য করেন। স্যারের সময় কলেজের পরিকাঠামোর আমূল পরিবর্তন ও উন্নতি হয়েছে। আমাদের রসায়ন বিভাগেরও প্রভূত উন্নতি হয়েছে। দুটো নতুন বৃহদাকার সুসজ্জিত পরীক্ষাগার তৈরি হয়েছে। আগে বর্ষার সময় স্টোর রুমে বন্যার জল ঢুকে প্রচুর রাসায়নিক পদার্থ নষ্ট হতো। তাই অনেকটা উঁচু করে নতুন স্টোররুম তৈরি হয়েছে। বিভাগে কম্পিউটার দেওয়া হয়েছে। নতুন সিলেবাসের সাথে সামঞ্জস্য রেখে নতুন নতুন যন্ত্রপাতি কেনা হয়েছে। সারটোরিয়াম ল্যাবরেটরি ব্যালেন্সের পরিবর্তে এসেছে ইলেকট্রিকাল ব্যালেন্স। সম্প্রতি তিনটি বিভাগ মিলে Spectrophotometer কেনা হয়েছে। আগের তুলনায় ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যাও বেড়েছে। আমরা আমাদের কলেজের ঐতিহ্যকে সাথে রেখে, প্রাক্তন শিক্ষকদের আদর্শকে পাথেয় করে নিজেরা এগিয়ে যাওয়া ও শিক্ষার্থীদের নিজ লক্ষ্যের দিকে এগিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করছি। আশা রাখবো, অদূর ভবিষ্যতে নেতাজী মহাবিদ্যালয় আরো উন্নতির দিকে এগিয়ে যাবে এবং আমরা তার সাক্ষী থাকবো। তার সাথে মনে থাকবে আমার প্রিয় রসায়ন বিভাগের ফেলে আসা সুন্দর দিনগুলোর কথা।